কাব্য-সুন্দরী।

ঔপন্যাসিক সুন্দরীগণের চরিত্র।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট
৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

সন ১২৮৭ সাল, শ্রাবণ।

বিজ্ঞাপন।

কাব্যামোদী পাঠক-বৃন্দের জন্য কাব্য-সুন্দরী প্রকাশিত হইল। গ্রন্থ-সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কুন্দনন্দিনীর কিয়দংশ এবং অপরগুলি আর্য্যদর্শনে প্রকাশ করি। সেই গুলি উদ্ধৃত, বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রচারিত করিলাম। আর্য্যদর্শনে শৈবলিনীর শেষভাগ যে রূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই আমি তাহা সংশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, এই জন্য সেই প্রতিবাদের আর প্রতিবাদ লিখি নাই।

সমৃদ্ধ জনগণের স্বর্ণ-কোষে যেরূপ রত্নরাজি সজ্জিত থাকে, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসাবলিতে তদ্রূপ কতিপয় রমণী-রত্ন সজ্জিত আছে। আমি সেই রত্নাগার হইতে এক একটী রত্ন বাছিয়া লইয়া লোক-লোচনের সমক্ষে তাহাদিগের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছি। কোন স্থলে হয় ত গুণগরিমার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করিয়া ফেলিয়াছি, কোন স্থলে হয় ত অন্ধ হইয়া সকল গুণ সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত করিতে পারি নাই। দোষকে হয় ত উপেক্ষা করিয়াছি, না হয় গুণরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। মুগ্ধজনের কাজই এই। আমি মুগ্ধ।

প্রকৃতির সুন্দর ও উন্নত ভাব প্রদর্শন করা কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্য-সুন্দরীগণ সেই কাব্য-কল্পনা সম্ভূতা। রমণীর সৌন্দর্য্য ও উন্নত ভাব এই কাব্য-সুন্দরীগণে যেমন বিকসিত আছে এমন শরীরী ও জীবিত রমণীগণে নাই। ইয়োরোপীয় বিশাল কাব্য-ভাণ্ডার এই কথার প্রমাণ। ভারতের সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যেও তদ্রূপ রমণী-রত্নের অসদ্ভাব নাই। বঙ্কিমবাবু বঙ্গভাষায় কতিপয় কাব্য-সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-ছটা প্রকাশিত করিয়া সেই ভাষাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। আমরা এক এক সময়ে যখন পার্থিব প্রকৃত সুন্দরীগণে অতৃপ্ত হই, তখন এই কাল্পনিক সুন্দরীগণের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি পড়ে। মনে করি, এইরূপ সুন্দরী পাইতাম ত সুখী হইতাম। এক এক সময়ে মন হইতে পৃথিবীকে বিসর্জন দিয়া এই সুন্দরীগণের আলাপন-সুখে এতদূর উন্মত্ত হইয়া যাই যে, আর কিছুই তখন ভাল লাগে না। কল্পনা এত দূর পূর্ণ হয় যেন তাহাদিগকে সঞ্জীবিত বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে; তখন তাঁহারা হৃদয়-মন্দিরে প্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। এইরূপ সুন্দরীগণকে বিশেষরূপে অনুচিত্রিত করিয়া দেখানই আমার উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থ তাহার প্রথম প্রয়াস।

গ্রন্থকার।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫	২০	বক্ষস্ফীতি	বক্ষঃস্ফীতি
১০	১	বাক্স্ফুর্ত্তি	বাক্স্ফূর্ত্তি
২৫	২৩	সদ্যপ্রস্ফুটিত	সদ্যঃপ্রস্ফুটিত
২৭	৮	অহর্ণিশ	অহর্নিশ
৩১	৭	বিষ্ফারিত	বিস্ফারিত
৩১	১৭	কুন্তল	কুণ্ডল
৩২	১৯	দৃস্তান্তে	দৃষ্টান্তে
৩৪	১৪	জাজ্বল্যমান	জাজ্বলামান
৩৯	২১	পরিষ্ফুট	পরিস্ফুট
৪১	১০	সিঁথিতে	কাঁকালে
৪১	১২	পুত্তলি	পুতলী
৪৩	১০	বৃহন্তুল্য	ব্যহতুল্য
৬২	১৭	কাদম্বিনীজাল	কাদম্বিনীজালে
৭৫	১০	সুষ্পষ্ট	সুস্পষ্ট
৮৬	৪	মুষল	মুষল
১৪২	১	পরিসেবিত	পরিষেবিত
১৫০	৪	প্রকৃতির দীনতাতে	প্রকৃতিতে দীনতার
১৫১	২৩	সত্তিনিপুত্র	সতিনপুত্র

রেফারেন্স আর গ্রন্থ

কাব্য-সুন্দরী।

কুন্দনন্দিনী।*

বিষবৃক্ষের চিত্রভূমিতে দৃষ্টিপাত হইলেই কতিপয় সুন্দর চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। একদিকে দেবেন্দ্র হীরার সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছেন, অন্যদিকে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর জন্য জাগরণে নিশাবসান করিতেছেন, এমত সময়ে সূর্য্যমুখী সহসা উদিতা হইয়া তদীয় মুখকমল প্রফুল্লিত করিলেন, অপর দিকে ঐ দেখ কমলমণি সূর্য্যমুখীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার মনোদুঃখ শ্রবণ করিতেছেন; আবার ঐ হরিদাসী বৈষ্ণবী কেমন গান গাইতে গাইতে, নৃত্য করিতে করিতে

---

* আমার প্রিয় সুহৃদ যোগেন্দ্র বাবু আর্য্যদর্শনে যে বিষবৃক্ষের বিস্তৃত সমালোচন লেখেন, তাহা প্রকাশিত হইবার দিন কয়েক পূর্ব্বে আমার এই কুন্দনন্দিনী প্রস্তাবের কিয়দংশ ১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকটিত হয়। আমরা কেহ কাহার প্রস্তাব দেখিয়া লিখি নাই। আমাদিগের প্রস্তাব এক সময়ে যন্ত্রস্থিত ছিল।

নগেন্দ্রের পৌরজনের চিত্তহরণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। দেবেন্দ্র, হীরা, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র ও কমলমণি ইহারা সকলেই বর্ণগৌরবে চিত্রভূমি উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের পার্শ্বে ঐ যে অবগুণ্ঠনবতী—মৃদুরঞ্জনে রঞ্জিত হইয়া অবনতমুখী অশ্রুপাতে মনোদুঃখ বিগলিত করিতেছেন, উহাকে কি তুমি চিনিতে পারিবে—উনি কুন্দনন্দিনী। উহার চিত্র তত বিভাসিত নহে, অতি কোমলবর্ণে মৃদুরঞ্জিত, কিন্তু উহার চিত্রে এমন মাধুর্য্য, এমন সৌন্দর্য্য আছে, যাহা তাহার পার্শ্বস্থ কোন উজ্জ্বল চিত্রে নাই। সূর্য্যমুখী উজ্জ্বলতরগুণে এবং কমলমণি তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতরগুণে পরিভূষিতা বটে, কিন্তু কুন্দনন্দিনীতে যে ধীর আবরিত সৌন্দর্য্য, যে কোমল রমণীয়তা, যে অসামান্য সলজ্জ সরলতা আছে, তাহা সূর্য্যমুখী ও কমলমণিতে নাই। বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষের বর্ণোদ্ভাসিত চিত্রভূমি আঁকিতে আঁকিতে কোথা দিয়া যে এই রমণীরত্নের চিত্র সুস্পষ্ট অথচ মৃদুবর্ণে আঁকিয়া গিয়াছেন, পাঠক তাহা শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারেন না। অপরাপর চিত্রের উজ্জ্বল অঙ্কপাতে তাঁহার চিত্ত এত আকৃষ্ট থাকে যে অশ্রুপূর্ণা বিমলিনা কুন্দনন্দিনীর দিকে তাঁহার সহজে দৃষ্টিপাত হয় না। কেহ না দেখাইয়া দিলে তিনি যেন দেখিতে পান না। এই জন্য বিষবৃক্ষের সমালোচনার আবশ্যক; নহিলে বিষবৃক্ষের সৌন্দর্য্য এবং গুণাবলী গ্রন্থকার নিজ অক্ষরেই এমন

সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, যে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচকের জন্য আর কিছুই রাখিয়া যান নাই।

বঙ্গের অন্ধ অন্তঃপুরীমধ্যে যে সকল কুলকামিনী রমণীরত্ন জন্মে, পৃথিবীর আর কোনখানে সেরূপ জন্মে কি না সন্দেহ। অনেক কারণে এখানে অনেক রমণী পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ততদূর পাতিব্রত্য অন্যদেশের কুলকামিনী সতীতে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। সূর্য্যমুখী এদেশে তত দুর্ল্লভ নহে, কিন্তু সূর্য্যমুখী অন্যদেশে নিশ্চয় সুদুর্ল্লভা; তদপেক্ষা কমলমণি, এবং কমলমণি অপেক্ষা কুন্দনন্দিনী। সূর্য্যমুখীর পাতিব্রত্য কায়মনোবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, কমলমণি একদিন সূর্য্যমুখীকেও পাতিব্রত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। কুন্দ নন্দিনীর পাতিব্রত্য কায়মনোবাক্যে প্রকাশিত নহে বটে, কিন্তু তজ্জন্য কিছুতেই ন্যূন নহে, বরং তজ্জন্যই অধিকতর উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এবং পবিত্র বলিয়া প্রতীত হয়। সূর্য্যমুখী অন্যদেশে দুর্ল্লভ, কিন্তু কুন্দনন্দিনী বঙ্গদেশেও দুর্ল্লভ। এখানে যদি দুই শতের মধ্যে একজন সূর্য্যমুখী থাকে, পঞ্চশতের মধ্যে একজন কমলমণি থাকে, তবে সহস্র বঙ্গগৃহবধূর মধ্যে একজন কুন্দনন্দিনী আছে কি না সন্দেহ। বঙ্গগৃহবধূর ভীরুতা, নম্রতা, সরলতা, অনভিজ্ঞতা ও কোমলতা যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে কুন্দনন্দিনীর ততদূর ছিল। বাস্তবিক কুন্দনন্দিনী মৃদুপ্রকৃতি বঙ্গগৃহবধূর অবয়বী কল্পনা।

এই জন্য কুন্দনন্দিনী এদেশেও দুর্ল্লভ। অপর দেশীয় কবি কুন্দনন্দিনীকে কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না। কিন্তু বিরল বলিয়াই, সূর্য্যমুখী অপেক্ষা কুন্দনন্দিনী শ্রেষ্ঠতরা নহেন। সূর্য্যমুখী বঙ্গগৃহের শোভা, কমলমণি গৃহধাম গুণে আলোকিত করেন, এবং কুন্দনন্দিনী সেই অন্ধধামের অস্রদেশে মাণিক্যের ন্যায় গোপনে উজ্জ্বলিত রহেন। যিনি এরূপ রত্ন চিনিতে পারেন, তিনি তুলিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন; যিনি না চিনিতে পারেন, তাহার মাণিক্য কুন্দনন্দিনীর ন্যায় অবশেষে পৃথ্বীতল হইতে আপনা-আপনি অদৃশ্য হয়।

ঐ যে সরোজিনী জলাশয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া, রূপে ঢল ঢল করিয়া, চারিদিক সৌরভে আমোদিত করিয়া, মলয়বায়ুহিল্লোলে জলতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া প্রফুল্লমুখ-বিকাশে উদ্যানরাজি প্রফুল্লিত করিয়াছে, উহা একদিন কমলমণির সহিত তুলনীয় হইতে পারে। আর ঐ যে পূর্ণবিকসিত, শতদলশোভিত, পরিমলসুগন্ধিত, রূপে আনন্দিত গোলাবকুসুম উদ্যানের মধ্যস্থিত গর্ব্বস্বরূপ হইয়া তোমার নয়নের তৃপ্তিসাধন করিতেছে, উহা সূর্য্যমুখীর সদৃশ চতুর্দ্দিক সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যদি কুন্দনন্দিনীর সাদৃশ্য দেখিতে চাও, তবে ঐ গোলাবেরই নিকটস্থ আর এক তরুশিরে গিয়া দেখ, একদল অর্দ্ধমুকুলিত গোলাবগুচ্ছ বৃন্তশিরে সুশো-ভিত রহিয়াছে; তাহার মধ্যকুসুম প্রস্ফুটিত প্রায়,

অথচ দলগুঞ্জে সম্যক্ প্রস্ফুটিতে পারে নাই। আর উহা ফুটিতে পারিবে না। তুমি অনুমানে উহাকে ফুটাইয়া লও, এবং বল দেখি, উহা সম্যক প্রস্ফুটিত হইলে, ঐ পূর্ণবিকসিত গোলাবের শোভা পরাজয় করিত কি না? কুন্দনন্দিনী ঐরূপ অর্দ্ধবিকসিত, পূর্ণ গোলাব স্বরূপ। অনুমানে তাহাকে ফুটাইয়া লইতে হয়। তাহা নিজে সম্যক্ শোভা বিকসিত করিতে পারে না। রূপে যেন গর্ব্বিত থাকে। পরিমলে হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, যিনি আদরে তাহাকে দেখিতে আসেন, তাহাকে আপনার হৃদয়ধন কথঞ্চিৎ বিতরণ করিয়া আমোদিত করেন। তাহার হৃদয়ে যে সম্পত্তিরাশি সঞ্চিত আছে, তাহা অন্যকুসুমে নাই; সেই জন্যই বুঝি সাহসভরে সম্যক্ প্রস্ফুটিতে পারে নাই।

কুন্দনন্দিনীর হৃদয়, এইরূপ, ভাবে পরিপূর্ণ। সে ভাব অবাতবিক্ষোভিত জলধির ন্যায় গভীর, অচঞ্চল, এবং স্থির। সে জলধি মথিত করিলে অমৃত উঠে। ঘটনা বায়ু তাহাতে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। যদি আলোড়িত ও তরঙ্গে আন্দোলিত করে, জলধি নিজ হৃদয়েই সে আন্দোলন ধারণ করিয়া রাখেন। চন্দ্র (নগেন্দ্র) হাসিলে তাহা আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু সে বক্ষস্ফীতি কেহ দেখিতে পায় না। চন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখহিল্লোলে নাচিতে থাকে। চন্দ্র সরসীর কুমুদিনীর (সূর্য্যমুখী) শোভাতেই মোহিত, তিনি এ

জলধির আনন্দভাস দেখিতে পান না। চন্দ্র একবার এই জলধিতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; আবার মেঘের উচ্চ সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন; বসিয়া সেই দূর পশ্চিম সরসীর কুমুদিনীর প্রতি হাসিতে লাগিলেন। মেঘে প্রবল বাত্যা বহিল। জলধি তমসাচ্ছন্ন ও আন্দোলিত হইল। আন্দোলন শেষ হইলে পর যখন শশী আবার প্রকাশিত হইলেন, তখন দেখা গেল তিনি সেই পশ্চিম সরসীর দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। শশী, জলধি পার হইয়া অস্তমিত প্রায়। তখন অর্দ্ধরাত্রের ঘন তিমির আসিয়া জলধিকে অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিল। জলধি, রজনীর বিশ্বব্যাপী ঘন তিমিরে ডুবিয়া গেলেন।

বাঙ্গালির মত ভীরুজাতি পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। কুন্দনন্দিনী এই ভীরুতার ফল। বাঙ্গালিনী রমণী কতদূর ভীরুস্বভাব হইতে পারে কুন্দনন্দিনী তাহা প্রকাশিত করে। সংসারের সাহসিকতা কিরূপ, কুন্দনন্দিনীর ন্যায় রমণী তাহা জানে না, ভাবিতেও পারে না; সে সাহসিকতার উপন্যাস বলিলে শিহরিয়া উঠে। যে অল্প বীর্য ও তেজ বাঙ্গালির আছে, তজ্জন্য সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকে। কেহ উচ্চরবে কথা কহিলেও ভীত হয়। পুষ্পের আঘাতেও মূর্চ্ছা যায়। জননীর নিতান্ত অঙ্কপ্রিয় হয়। কিছু করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে ভয় পায়। উচ্চরবে কথা কহিতে জানে না। অন্যে উচ্চরবে কথা কহিলে থমকিয়া কাঁদিয়া পড়ে। কেহ

কিছু বলিলে কুটীর মধ্যে একাকিনী বসিয়া নীরবে কাঁদিতে থাকে। তাহার অবগুণ্ঠনবিমুক্ত মুখচন্দ্রিমা অল্পলোকেই দেখিতে পায়। একাকিনী থাকিতে ভাল বাসে। অন্যান্য রমণীর সহিত মিশিতে সাহস হয় না। মিশিলে তাহাদিগের সহিত দুই একটি কথা মাত্র কয়। তাহাদিগের সহিত অগ্রসারিণী হইয়া কার্য্য করিতে যায় না, হয় ত এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে। অবগুণ্ঠন টানিয়া পরের সাহস ও কার্য্য দেখিতে থাকে। পরের প্রতি দুই চক্ষে চাহিতেও ভয় পায়। চক্ষে চক্ষে মিলিলে অমনি নয়নপল্লব ফেলিয়া মুখ অবনত করে। মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে পারে না, ইচ্ছা হইলে মনে মনেই বিলীন হয়। কোন ইচ্ছা প্রকাশিত করিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলে তাহা আপনি সাহস ভরে বলিতে পারে না; সঙ্গিনীর সহিত চুপি চুপি কাণে কাণে কহিয়া দেয়। সে ইচ্ছা, দেখা যায়, অন্য রমণীর ইচ্ছার সহিত কিছু স্বতন্ত্র। অন্যের সহিত সে ইচ্ছার কিছু বিশেষ হইবেই হইবে। সে ইচ্ছাতে হয় ত ধীরতা আছে, নম্রতা আছে; উচ্চাশা নাই, সাহস নাই। হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিলে কুন্দ-নন্দিনী এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। অনুরুদ্ধা না হইলে, যাহা হইত ও ঘটিত, তিনি নীরবে ও নিঃশব্দে তাহা শুনিয়া ও দেখিয়া যাইতেন। সহিষ্ণুতা, ভীরুতার ফল। সুতরাং কুন্দের ন্যায় রমণীর সহিষ্ণুতা থাকা অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম। আবার প্রকৃত সোহাগ কি, তাহা

ইহারাই জানে, ইহাদিগেরই থাকে। ইহাদিগেরই প্রকৃতিতে ভীরুতা কোমলতার সহিত মিশিয়া যায়। কোমলতার সহিত না মিশিলে ইহাদিগের ভীরুতা অন্যবিধ কামিনীর স্বাভাবিক ভীরুতার সহিত সমান হইত, তাহার বিশেষ ভাব লক্ষিত হইত না। হৃদয়ের কোমলতার সহিত ভীরুতা মিশিয়া প্রকৃতি যে সুকোমল-ভাব ধারণ করে তাহা বাঙ্গালির প্রকৃতিতে আছে। তাহা বাঙ্গালিনী রমণীতে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গা-লিনীতে তাহা এক সুন্দর অভূতপূর্ব্ব রমণীয়ভাব ধারণ করিয়াছে। কুন্দনন্দিনী সেই অভূতপূর্ব্ব সুকোমলতার অবয়বী কল্পনা ও সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই সুকোমলতা প্রকৃত জীবনে এতদূর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে মাত্রায় কুন্দনন্দিনী প্রকৃত জীবনের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, সেই মাত্রা, কবির চিত্রবিভাস, তাহাই কাব্য-সৃষ্টি। প্রকৃত জীবনে বঙ্গগৃহলক্ষ্মী তাহার অনেকদূর নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারেন, কিন্তু ঠিক্ সেই উচ্চতায় উঠিতে পারেন না। প্রকৃত জীবনের উপর এই অত্যল্প মাত্রায় উচ্চতা দেওয়া কবির কার্য্য। এই উচ্চতা কেবল উপন্যাসে ও কাব্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি কবি নহেন, যিনি সামান্য লেখক, তিনি এই বর্ণগৌরব, প্রকৃত চিত্রে এই বর্ণবিভাস দিতে সমর্থ হয়েন না। এই ঈষৎ চিত্র-রঞ্জন সূর্য্যমুখী ও কমলমণিতেও আছে, তবে তাহাদিগের চিত্রের সহিত কুন্দনন্দিনীর চিত্রের প্রভেদ এই, কোমল-

বর্ণ বঙ্গগৃহবধূ কুন্দনন্দিনীতে কোমলতর বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সূর্য্যমুখী ও কমলমণি উজ্জ্বলবর্ণে উজ্জ্বলতরা হইয়াছেন। প্রকৃত জীবনের চিত্র বঙ্কিমবাবু অল্পই লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহর বিষবৃক্ষ সমুদায় প্রকৃত জীবনের চিত্র। অথচ প্রকৃত জীবনের চিত্র ধরিলে, বঙ্কিম বাবুর ন্যায় ভাবচিত্রকর সেই চিত্রে কেমন কাব্য-সৃষ্টি দেখাইতে পারেন তাহা বিষবৃক্ষের চিত্রাবলীতে স্পষ্টবর্ণে প্রতীত হয়।

ভাবময়ী কুন্দনন্দিনী কোমলতায় পরিপূর্ণ। কুন্দনন্দিনীর যদি কিছু গুণ ও সম্পত্তি থাকে তাহা তাহার হৃদ, য়প্রেম, সহৃদয়তা, ও কোমলতা। শেলির লজ্জাবতী লতা এতদূর কোমলপ্রকৃতি নহে। তাহার হৃদয়, ভাবে সর্ব্বদাই উদ্বেলিত হইত। তিনি স্বভাবগুণে কোমল-ভাবকে কোমলতর করিতেন। তাহার ভাবোদ্বেগ হৃদয়কে স্তম্ভিত করিয়া রাখিত। কখন অশ্রুধারায় বিগলিত হইত। অশ্রুধারাই সে হৃদয়পূর্ণতার বাহ্যবিকাশ। সূর্য্য-মুখী হৃদয়ভাবকে সুন্দর প্রকাশিত করিতে জানিতেন। এমত কি, অনেক সময় তাহার ভাবব্যক্তি হৃদয়স্থ ভাবকে সুন্দরতর করিয়া দেখাইত। কুন্দনন্দিনী ভাব প্রকাশ করিতে জানিতেন না। তাহার ভাব নিজেই প্রকাশিত হইয়া পড়িত, ভাবপূর্ণতা উথলিয়া পড়িত। কিন্তু তাহার এই নিগূঢ় ভাববিকাশ কি সূর্য্যমুখীর সহিত সমান অর্থ-পূর্ণ ছিল না? যিনি তাহা পড়িতে জানিতেন, অশ্রুধারা

ও অস্ফুট বাক্‌স্ফুর্ত্তি তাঁহার নিকট অধিকতর অর্থপূর্ণ বোধ হইত। কমলমণি তাহার নিগূঢ় অর্থ তন্ন তন্ন বুঝিতেন। নগেন্দ্র তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কুন্দনন্দিনীর অগাধভাবপূর্ণতা কখন নীরবতায়, কখন অশ্রুধারায়, কখন একটি মাত্র ক্ষুদ্রকথায় অর্থপূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইত। সে বিকাশ সূর্য্যমুখীর বাক্‌পূর্ণতা অপেক্ষাও অধিকতর অর্থপূর্ণ। সূর্য্যমুখীর বাক্‌পূর্ণতা হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট প্রকাশিত করিত। কুন্দনন্দিনীর অবাক্‌স্ফূর্ত্তি হৃদয়ের আভাস মাত্র দিত—সে হৃদয় কত গভীর, কত পূর্ণ, সম্যক্ প্রকাশিত করিত না। যাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িত তাহা হৃদয়ের অস্ফুটভাবব্যক্তি। সে ক্ষুদ্র আলোকে তাহার হৃদয়ের পূর্ণতা মাত্র দেখাইত, গভীরতার আভাস মাত্র দিত। দেখাইত, কুন্দনন্দিনীর যাহা কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা তাহার ভাবপূর্ণ সরলতাময় সুন্দর হৃদয়। সেই হৃদয়ের গভীরতা কত, সে আলোকে দেখা যাইত না। বোধ হইত সেই হৃদয়-গভীরে অনেক রত্ন নিহিত আছে।

এই পূর্ণহৃদয়ের কি বাহ্যবিকাশ হয়? হৃদয় ফাটিয়া ইহার কিঞ্চিন্মাত্রা সময়ে সময়ে বাহিরে বহিয়া পড়ে। নীরবতা ইহার স্তম্ভিতভাব দেখায়, অশ্রুধারা ইহার কোমলতা দেখায়, এবং দুই একটী মৃদু কথা মাত্র ইহার গাম্ভীর্য্য ও সুন্দরতা দেখায়। অবাক্‌স্ফুর্ত্তি কুন্দনন্দিনীর প্রকৃতি-বিশেষ নহে, কিন্তু ইহা তাহার প্রকৃতি বিশেষের

ফল। যে বাপীকূলে প্রদোষকালে একদা কুন্দনন্দিনী বসিয়া নীলপ্রভ জলরাশিতে প্রতিবিম্বিত আকাশচিত্রে জলের গাম্ভীর্য্য দেখিতেছিলেন, কুন্দনন্দিনী জানিতেন না যে, সেই স্থির নীলবর্ণ, কাল জলরাশি তাঁহার হৃদয়ের সদৃশ বলিয়াই সেখানে বসিয়া তিনি হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন, হৃদয় একবার অধ্যয়ন করিলেন, সে জলে তিনি নিজে নিমজ্জিতা হইতে পারিলেন না ; তাহা অপরকে নিমজ্জিতা করিতে পারিত। কুন্দনন্দিনীর হৃদয় তেমতি তরল, তেমতি পূর্ণ, তেমতি নীল, তেমতি কালিমায় সুগভীর। যে হৃদয়াকাশ ইহার উপর আসিয়া পড়িত, তাহার সুন্দর তারকাবলি ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিত, ইহার গাম্ভীর্য্য দেখাইত, ইহার কালিমা এবং তরলতা প্রকাশিত করিত। সূর্য্যমুখী সেই হৃদয়াকাশ, নগেন্দ্র সেই হৃদয়াকাশ এবং কমলমণি সেই অশেষ তারারাজিত হৃদয়াকাশ। কুন্দনন্দিনী কেবল নগেন্দ্রকেই প্রতিবিম্বিত করিয়াছিলেন এমত নহে, সূর্য্যমুখীরও বিরহে কাতরা, এবং কমলমণির সমক্ষে হৃদয় খুলিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে কমল হৃদয়ের তারারাজি ফুটিয়া ছিল বটে, কিন্তু সে আলোকে কুন্দ-নন্দিনীর হৃদয় আলোকিত হয় নাই, তাহার নীলিমা, গভীরতা ও তরলতাই প্রকাশ করিয়াছিল।

বঙ্গগৃহবধূ যখন অবগুণ্ঠনে নিজ মুখমণ্ডল আবরিত করিয়া রাখেন, তখন কেহই জানিতে পারেন না সেই

অবগুণ্ঠন মধ্যে কি রূপরাশি লুক্কায়িত আছে। সেই অবগুণ্ঠন বিমুক্ত হইলে যখন অচিরাৎ এক অপূর্ব্ব মোহিনীমূর্ত্তি তোমার নিকট প্রকাশিত হয়; তখন দেখিয়া চমকিত হও, সে কি রূপ!—না কমলকান্তি, সেই কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত, সুন্দর, নবীন, মধুর, প্রফুল্ল অথচ সুকুমার; সে কি রূপ!—না চন্দ্রবিভা, সেই চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ, কোমল অথচ আলোকময়; নয়নমুদিত আছে, নহিলেসে নয়নকটাক্ষে তোমার হৃদয় এখনি অস্থির হইত; কুসুমশর কোমল কি তীক্ষ্ণ এখনি জানিতে পারিতে। অধরে বর্ণরাগ ফুটিয়াছে, যেন চুম্বনের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছে। অবগুণ্ঠনবিমুক্ত সেইরূপ-মাধুরী দেখিয়া যেমন মোহিত ও আশ্চর্য্য হইতে হয়, কুন্দনন্দিনীর হৃদয় নীরবতার আবরণ বিমুক্ত হইয়া যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আমরা তদ্রূপ মোহিত ও আশ্চর্য্য হই। আমরা এই আবরণ ভেদ করিয়া তাহার হৃদয় দেখিবার জন্য বরাবর তাহাকে অনুসরণ করিয়াছি। সেই ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা যখন মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসিয়া ছল ছল করিয়া চাহিয়া আছেন, তখন ভাবিতেও পারেন না যে তাহার পিতার মৃত্যু সন্নিকট, কেন না তাহা হইলে তিনি একেবারে নিরাশ্রয়া হইবেন। মৃত্যু অঙ্কে তাহাকে শায়িত দেখিয়া ভাবিতেছেন, তিনি বুঝি আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন। তিনি পৃথিবীর ভাব গতিক কিছুই জানেন না। তখনকার এই সরলতা দেখিয়া

ভাবিলাম, ইহা তাহার বালস্বভাবের অনভিজ্ঞতা মাত্র; কারণ, এই তাহার প্রথম পরিচয়। তৎপরে যখন চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্রের দিকে লইয়া যাইতেছেন, "আসিতে আসিতে দূর হইতে তখন নগেন্দ্রকে দেখিয়া, কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।" "দেখিল যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, নগেন্দ্র ঠিক্ সেই মূর্ত্তি। তখন তাহাকে ভয়বিহ্বলা ও সঙ্কুচিতা দেখিয়া নগেন্দ্র কুন্দকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।" তৎপরে তাহার অনুগমনে কলিকাতায় যাইলেন। এই নিরীহ, অশক্ত, সরল বালিকা যখন স্নেহময়ী কমলের নিকট লেখা পড়া শিখেন তখন তিনি লেখা পড়া সুন্দর শিখিতে পারেন, "কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝেন না। বলিলে, বৃহৎ, নীল, দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটী চক্ষু নগেন্দ্রের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছুই বলে না—নগেন্দ্র সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হন।" সে চক্ষের প্রভাব নগেন্দ্র কেন, অন্য লোকেও বিলক্ষণ অনুভব করিত। সে দৃষ্টির সরলতা, অর্থপূর্ণতা, নিরাশ্রয়ের ভাবব্যঞ্জকতা, সূর্য্যমুখীও সহস্রবাক্যে তত সুন্দর প্রকাশ

করিতে পারিতেন না। তারাচরণ যখন এই কুন্দনন্দিনী-কে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন, "কুন্দ তখন দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিলেন? ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন।" তাঁহার এই ব্যবহার সকলই নীরব, অথচ কত দূর ভাবব্যঞ্জক। প্রথমে তিনি থতমত খাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় ঘোমটা দিলেন, অনন্তর কি করিবেন কিছুই জানেন না বলিয়া ক্ষণিক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাঁড়াইয়া, কি ভাবিলেন। অবশেষে, একদা লজ্জায়, অপমানে, আত্মতিরস্কারে হৃদয় উদ্বেলিত হইল; তখন তিনি কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। আর কোন রমণী দেবেন্দ্রের নিকট আনীত হইতে হয়তো সম্মতা হইত না। কিন্তু সরলা কুন্দ কিছুই জানেন না, তিনি জড়ের মত আনীত হইলেন; আনীত হইয়া আত্মপরিচয় দিয়া পলাইয়া গেলেন। সরলা, ভাবময়ী কুন্দকে লইয়া কি কোন ক্রীড়া চলে? তাহার ভাবপূর্ণ জড়প্রায় ব্যবহার ক্রীড়ার অতীত।

ইহার পর হরিদাসী বৈষ্ণবীর অভিনয়। নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে হরিদাসী গাইতে আসিলে, শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরাম্ভ করিলেন। বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিলঃ—

"হাঁ গা তুমি কিছু ফরমাশ করিলে না?"

"কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিলনা। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, কীর্ত্তন গায়িতে বল না?" এতক্ষণ সবাই নানাবিধ ফরমাস্ করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ চুপ করিয়াছিল। বিশেষ রূপে অনুরুদ্ধা হইলে কুন্দ আনন্দে একটু হাসিল; কিন্তু তা বলিয়া ধৃষ্টতা দেখাইয়া উত্তর করিবার লোক তিনি নহেন। তিনি এখন পূর্ণযৌবনা, বয়স ষোড়শেরও অধিক। যুবতীর কি এই ব্যবহার? যৌবনের সে চঞ্চলতা ও অধীরতা কোথায়? কুন্দের ইচ্ছা মনে মনেই বিলীন হইতেছিল। অপরে সে ইচ্ছা জানিতে চাহিলে তিনি সাহস ভরে তাহা উচ্চরবে প্রকাশ করিতেও পারেন নাই। একজন বয়স্যার কাণে কাণে বলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। বঙ্কিম বাবুর এই চিত্রটি কেমন স্বভাবানুরূপ, কেমন সংক্ষেপে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ! ইহা কুন্দনন্দিনীর যথাযথই চিত্র বটে। কুন্দনন্দিনীর এই প্রকৃতি বিশেষ সুস্পষ্ট দেখাইবার জন্যই তিনি নানাবিধ রমণীমণ্ডলে তাহাকে আনিলেন, পরে বহুবিধ রমণীগণের সহিত তাহার প্রভেদ কি, তাহা কবির একটি মাত্র সুন্দর চিত্রলেখায় সমুদায় প্রকাশিত করিয়া দিলেন।

এতক্ষণ আমরা কুন্দনন্দিনীর প্রকৃতি বিশেষেরই পর্য্যালোচনা করিয়াছি। দেখিলাম সরলতা ও বালিকাত্বময় ভ

অচঞ্চলতা, ভীরুতা ও মৃদুতা হেতু নিশ্চেষ্টতা, বিচিত্রভাবে তাহার রমণীপ্রকৃতিতে মিশিয়াছে। মিশিয়া এক অসামান্য বিচিত্র রমণীকে প্রদর্শন করিল। এ প্রকৃতির রমণী কেবল বঙ্গধামেই পাওয়া যায়। বঙ্গরমণীর এইপ্রকৃতিবিশেষের ব্যবধানে কিরূপ কোমল হৃদয় লুক্কায়িত থাকে, তাহা বঙ্কিম বাবু এখনও প্রকাশিত করেন নাই। তিনি প্রথমে বাহ্যরেখায় এই বিচিত্র রমণীর ছায়াপাত মাত্র করিলেন; এই ছায়াপাতেই চেনা গেল কুন্দনন্দিনী কোন্ প্রকৃতির বঙ্গগৃহবধূ। তৎপরে বঙ্কিম বাবু সহসা অথচ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় আবরণ খুলিতে লাগিলেন। তখন পাঠক কুন্দের হৃদয়লাবণ্য দেখিয়া আরও চমকিত হইলেন। চমকিত হইয়া বলিলেন, এমন অগৌরবিণী মৃদু প্রকৃতির ভিতরে যে এমন হৃদয়মাধুরী ও সৌকুমার্য্য লুক্কায়িত থাকিবে তাহা বিচিত্র নহে। এইরূপ প্রকৃতির এইরূপ হৃদয় হওয়াই উচিত, এবং এইরূপ হৃদয়ের এইরূপ প্রকৃতিই উপযোগিনী হইয়া থাকে। আমরা এক্ষণে কুন্দনন্দিনীর সেই হৃদয়সৌন্দর্য্য কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কুন্দের ভীরু ও কোমল প্রকৃতিতে প্রেম এত নিস্তেজ হইয়াছিল যে, ইহা কেবল নগেন্দ্রের দর্শনসুখেই অনেক পরিমাণে চরিতার্থতা লাভ করিত। তদতিরিক্ত চরিতার্থতা প্রদান করা কুন্দের কার্য্য নহে। কুন্দ সেই জন্য গোপনে গোপনে কেবল নগেন্দ্রকে দেখিত—প্রাণ ভরিয়া হৃদয়কে

তৃপ্ত করিয়া দেখিত। দেখিত?—না ভালবাসিত—সেই দৃষ্টিতেই ভালবাসা পরিপূর্ণ ছিল—প্রাণের সহিত ভালবাসিত—যৌবনের প্রথম প্রবল অনুরাগের সহিত ভালবাসিত—হৃদয়ের সরল ভালবাসার সহিত ভালবাসিত। নিরভিলাষিণী কুন্দের হৃদয় এই প্রেমে স্তম্ভিত ছিল। অগাধ সাগরের ন্যায় স্থির ও অচঞ্চল ছিল। সেই স্থির প্রেমরাশিতে নগেন্দ্রের মুখশশী ভাসিতেছিল। কমলমণি আসিয়া কুন্দনন্দিনীর প্রেমপূরিত পূর্ণহৃদয়ে একটু বায়ু সঞ্চালন করিলেন। কমল বলিলেন, "তুই দাদাকে বড় ভালবাসিস্,—না?" না?—এই কথা জিজ্ঞাসা করাতেই কুন্দের ভালবাসার সমুদয় আবেগ হৃদয়ে সঞ্চালিত হইল। অমনি তিনি লজ্জায় জড়সড় হইলেন, উত্তর দিতে পারিলেন না। কমলমণির বক্ষমাঝে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যেন হৃদয়ের চৌর্য্যধন লুকাইতে গেলেন, যেন কমলমণির হৃদয় মধ্যে সহানুভূতি খুঁজিতে গেলেন। ধরা পড়িলেন বলিয়া অপ্রতিভ হইলেন—অপ্রতিভ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেরূপ সুকুমার ও মৃদু হৃদয়ের জড়িত ভাববিকাশই এই। সরলা কুন্দনন্দিনী আত্মগোপন কিরূপ তাহা জানেন না। জানেন না বলিয়া চতুরা কমলমণির নিকট ধরা পড়িলেন। কমল তখনি বলিলেন, "বুঝিয়াছি,—মরিয়াছ।" কিন্তু যে ভাবে কুন্দনন্দিনীর হৃদয়-কাব্য বাহিরে প্রস্ফুটিত হইল, তাহা অতি নিগূঢ়, তাহা অন্যের নিকট প্রহেলিকা। প্রেমময়ী কমল নিজ হৃদয় দিয়া সে

হৃদয়কাব্য বুঝিলেন। বুঝিলেন, ঈষৎ বায়ুপ্রাবল্যেও লজ্জাবতীলতা কুঞ্চিতা হয়। নগেন্দ্র যে কুন্দকে এত ভালবাসে, কমল জানিত, কুন্দ তাহা বুঝিত না। এই জন্য কমল আবার বুঝাইয়া দিতে গেলেন, "পোড়ারমুখী, চোকের মাথা খেয়েছ? দেখিতে পাও না যে, দাদা তোকে ভালবাসে?" কুন্দ তখন বুঝিলেন, কমল কেন বলিয়াছে, আমার সঙ্গে অনেকে যে মরে। বুঝিয়া আপনাকে অপরাধিনী ভাবিলেন। তখন কুন্দের মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দ অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিলেন। তৎপরে কুন্দ কমলের প্রস্তাবে কলিকাতায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন। কোমলহৃদয়া কুন্দ কাহারও অহিতার্থিনী হইতে কুণ্ঠিতা হইত বলিয়া কমলের কথায় যেই বুঝিলেন যে আমি অনেক অনর্থের কারণ হইয়াছি অমনি তিনি "পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিলেন"। কমল কুন্দকে সম্মতা করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুন্দ তখন একাকিনী নির্জ্জনে বসিয়া অনেক ভাবিলেন। কমলের কথাবার্ত্তায় তাহার হৃদয়ে অনেক নূতন ভাব সঞ্চারিত হইল। এত দিনের পর তাহার হৃদয়বীণার সকল তার বাজিয়া উঠিল। কমল যে বলিয়াছে "দাদা তাহাকে ভালবাসে" এই আশাবাক্য তাহার প্রেমকে প্রস্ফুরিত করিয়া দিল। তাহার সুকুমার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিল। যৌবন কি, এক দিন কুন্দনন্দিনীকে জানাইল। যৌবনের

রাগ কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে উঠিল। মন টলিল, শির টলিল শরীর টলিল। নগেন্দ্র তাহার কে, কুন্দ এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। নগেন্দ্রের ভাবী-বিরহ কত কষ্টকর কুন্দ বুঝিলেন। নগেন্দ্র যখন তাহাকে এত ভালবাসে, তখন তিনি নগেন্দ্রকে ছাড়িয়া কিরূপে থাকিবেন। কমল তাহাকে যে সত্যসত্যই কলিকাতায় লইয়া যাইবে। এক দিকে তাহার হৃদয় নবরাগে বিষম উত্তাপিত হইতেছিল, অন্যদিকে নৈরাশ্যের শীতল হস্ত তাহাতে বিস্তৃত হইতেছিল। কুন্দ এই বিপর্য্যয়ভাবে অস্থির হইলেন। অবশেষে তাহার হৃদয়ের নবীভূত ভাবই প্রবল হইয়া উঠিল। কুন্দ তখন বুঝিলেন, তিনি নগেন্দ্রকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিবেন না। কুন্দ জলে ডুবিয়া মরিবেন সেও ভাল, তবু নগেন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না। কুন্দ সেই নবীভূত প্রেমতরল হৃদয়ের অধীরতায়, এবং যৌবনের চঞ্চলতায়, অবশেষে এই সঙ্কল্প করিলেন। কুন্দের মত রমণী এতদ্ভিন্ন অন্য সঙ্কল্প করিতে পারে না। দিবালোক নির্ব্বাপিত না হইতে হইতে, অর্দ্ধ অধীরতার সহিত, অর্দ্ধ গোপনের সহিত, অর্দ্ধ অন্ধকারে তিনি জনহীন বাপীকূলে উপস্থিত। সেখানে কুন্দ-হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত একবার উথলিয়া উঠিল। কুন্দ চিরদিনের জন্য একবার নগেন্দ্র-প্রেম সন্তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া নগেন্দ্রের নাম বহির্গত হইল। তিনি

সেই নামোচ্চারণে উন্মাদিনী হইলেন। নির্জ্জনে চারিদিক দেখেন আর সেই সুধাময় নামোচ্চারণ করেন। জীবনের নৈরাশ্যে তাহার এক দিন সাহস বাড়িল। এত দূর সাহস তাহার আর কখন হয় নাই। এত দূর প্রেমাবেগে কখন অধীরা হয়েন নাই। এখন তিনি চৌরের মত সেই নির্জ্জনদেশে আপনার হৃদয়ের চৌর্য্যধন অল্প অল্প বাহির করিতে লাগিলেন, বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন; আবার ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়গভীরে লুকাইতে লাগিলেন। এখানে কুন্দকে কে দেখিতেছে? তবু কুন্দের এত ভয় কেন?—ইহা কুন্দের স্বভাবসিদ্ধ। মরিতে আসিয়া মাতার স্বপ্নের কথা মনে পড়িতে লাগিল। কুন্দ আর সুস্থির থাকিতে পারেন না। তিনি মরিবার জন্য অগ্রসারিণী হইলেন। এমত সময়ে ঘটনাক্রমে নগেন্দ্র উপস্থিত। আশাতীত নগেন্দ্র-দর্শনে কুন্দ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যে গোপনীয় নগেন্দ্রপ্রেমে তিনি আত্মবলি দিতে যাইতেছিলেন, সেই প্রেমপ্রতিমা নগেন্দ্র এত দিনের পর সহসা কুন্দের নিকট অধীরতার সহিত আপনিই উপস্থিত। প্রেম আসিয়া প্রেমের সহিত মিশিয়া গেল। কমলমণির কথা সত্য হইল। নগেন্দ্র তাহাকে যথার্থই ভালবাসে। কুন্দের মন টলিল; কুন্দ প্রেমে গলিয়া গেলেন। একি তাহার মরিবার সময়? কুন্দের এমন সুখের সময় আর কখন উপস্থিত হয় নাই। ইহা প্রেম-মৃত্যুর পরলোক। কুন্দ

সেই পরলোকে পুনর্জ্জীবিতা হইলেন। নগেন্দ্রকে পাইলেন, পাইয়া ক্ষণেকের জন্য সুখিনী হইলেন। এই দুঃখময়ী পৃথিবীতে ক্ষণেকের জন্য স্বর্গসুখ পাইলেন।

নগেন্দ্র আসিয়া এত দিনের পর তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিল। তাহার জন্য কত যন্ত্রণাভোগ করিয়াছেন, সকল খুলিয়া বলিল। কুন্দ কি মধুর রব শুনিলেন! তিনি এ নগেন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? তিনি সবে মাত্র কমলমণির কথায় উদ্বোধিতা হইয়াছেন। সে উদ্বোধনের আবেগ হৃদয় হইতে এখনও সম্যক্ প্রস্থান করে নাই। সেই আবেগ পুনরায় সমপ্রবল হইয়া ফিরিয়া আসিল। হৃদয় আবার তরঙ্গিত হইল। আশার মলয় বহিতে লাগিল। নৈরাশ্য চলিয়া গেল। এত দিন কেন নগেন্দ্র তাহাকে আজিকার মত সম্ভাষণ করেন নাই বলিয়া, তিনি দুঃখিত হইলেন। সোহাগে সে দুঃখ গলিয়া গেল। কুন্দ অশ্রুপাত করিলেন—এত দিনের পর নগেন্দ্রকে আপনার জ্ঞান করিয়া অশ্রুপাত করিলেন। নগেন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "কুন্দ কাঁদিতেছ কেন?" কুন্দ অমনি অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কুন্দ কথা কহিতে পারিল না। তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তখনকার ভাব বাক্যে প্রকাশ হয় না। নগেন্দ্রের ব্যথার কথা শুনিয়া তাহার ব্যথা একেবারে শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। তিনি সুতরাং কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই রোদনে যে কত অসংখ্য ভাব মিশ্রিত ছিল,

তাহা কে বলিতে পারে? কুন্দের হৃদয়ে একদা ক্ষোভ, সন্তাপ, দুঃখ, প্রেম, যৌবন, অধীরতা, মমতা, আশা, অভিমান, লজ্জা, প্রভৃতি কত কোমলভাব একত্রে উদিত হইয়া একত্রে ক্রন্দনে পরিণত হইল। পলকে সকলই উঠিল, আর বিলীন হইল। কুন্দ নগেন্দ্রকে আপনার ভাবিয়া কাঁদিল; হৃদয় ব্যথা জানাইবার নহে বলিয়া কাঁদিল। নগেন্দ্রের এ ব্যথার কথা না পাইয়াও কুন্দ যে তাহাকে এতকাল ভাল বাসিয়াছে, এবং সেই ভালবাসার জন্য যে মরিতে আসিয়াছে, কুন্দ তাহা বলিতে পারিল না বলিয়া কাঁদিল। যে প্রেমে কুন্দনন্দিনী হৃদয়ে কাঁদিতেছিল, সেই প্রেমে কুন্দ কাঁদিল। পতিসোহাগ কি, কুন্দ এতদিনে জানিলেন। তিনি সেই সোহাগে গলিয়া গিয়া ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হইলেন। এত দিনের পর প্রাণনাথের পার্শ্ব-বর্ত্তিনী হইয়া, তাহার ব্যথার কথা শুনিয়া তিনি আত্ম হারাইলেন। হৃদয়ের এ ভাব তিরোহিত না হইতে হইতে—এত ভাবোদ্বেগ না যাইতে যাইতে নগেন্দ্র একেবারে বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। আজিও কুন্দ তাহার নিকট লজ্জাভাঙ্গা হয় নাই। কুন্দ আজিও প্রেম প্রকাশ করে নাই। নগেন্দ্রের কি এখনি এই প্রস্তাব করিবার সময়? আগে নগেন্দ্র-হৃদয়ের সহিত কুন্দ-হৃদয়ের মিলন হউক। তবে ত কুন্দ তাহার নিকট হৃদয়ের সরল ভাব অকপটে ব্যক্ত করিবে। সে অবসর

এখনও উপস্থিত হয় নাই। উপস্থিত না হইতে হইতে নগেন্দ্র যে প্রস্তাব করিলেন, কুন্দ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এখন আবার তিনি আত্মহারা। তাহার এতদূর সাহস হয় নাই, যে তিনি নগেন্দ্রকে একেবারে বিবাহ করিবেন, বলিতে পারেন। এতদূর সাহস হয় নাই, যে তিনি লজ্জাকে পরাজয় করেন। সুতরাং নগেন্দ্র এখন তাহাকে যাহা বলেন, তাহাতেই "না" বলিতে লাগিলেন। লজ্জা তাহাকে সকলেতেই "না" বলাইতে লাগিল। বাস্তবিক কুন্দ যে তখন কি বলিতেছেন কুন্দ তাহা জানেন না। তিনি এক "না" য়ের সুরে সকল কথাতেই না বলিতে লাগিলেন। যুবতী প্রণয়িনীর প্রাণবল্লভের নিকট প্রথম হৃদয় খুলিবার উক্তিই এই। এ নায়ের অর্থ হাঁ অথবা ইহার অর্থই নাই। ইহা লজ্জাবোধক, অপ্রতিভ-ভাবব্যঞ্জক। পাছে হৃদয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, ইহা সেই ভাব-ব্যঞ্জক। রমণী হৃদয়ের কোমল সোহাগ, লজ্জা এই আবরণে প্রথমে ঢাকিতে যায়। ইহা শূন্য উক্তি মাত্র। কুন্দনন্দিনীর প্রকৃতিতে এই না দ্বিগুণতর উপযোগী। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস মধ্যে এমন সুন্দর স্বভাবচিত্র অতি অল্পস্থলেই দেখা যায়। এই দেখুন বঙ্কিমবাবু কুন্দ-নগেন্দ্রের মিলনদৃশ্য কেমন সুন্দর স্বাভাবিক বর্ণে আঁকিয়া গেলেন।

নগেন্দ্র যখন বলিলেন ঃ—

"তুমি বলিলেই বিবাহ করি"।

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল—"না"।

আবার নগেন্দ্র বলিলেন—"কেন কুন্দ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?" কুন্দ আবার বলিল—"না"। নগেন্দ্র বলিল "তবে না কেন? বল, বল,—বল আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না?"

কুন্দ বলিল—"না"।

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্রমুখে, অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন।

কুন্দ বলিল—"না"।

নগেন্দ্র কি এ "না"য়ের অর্থ বুঝিতে পারেন? তিনি চিরকাল সূর্যমুখীর ভালবাসা মাখা কথা শুনিয়াছেন। তাহার সহিত কুন্দের কথায় অনেক প্রভেদ। সুতরাং নগেন্দ্র এ "না"য়ের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ইহার অনতিকাল পরে কুন্দ আর একটি এমন ঘটনায় উপস্থিত হইলেন, যাহাতে তাহার প্রণয় উজ্জ্বলতর হইয়া প্রতিভাত হইল। সূর্য্যমুখীর তিরস্কার, অপমান, ও ভয়ে কুন্দনন্দিনী গৃহত্যাগিনী হইলেন। গৃহত্যাগিনী হইয়া পথে যাইতে যাইতে সরলা বালা যেরূপ সুন্দর প্রণয় পরিচয় দিয়াছিল, সেরূপ প্রণয় পরিচয় কোন বিচ্ছেদ দৃশ্যে ঘটিত না, কোন বিচ্ছেদদৃশ্য তদপেক্ষা সুন্দরতর নাই। কিন্তু কুন্দনন্দিনী কোথায় যাইবে? কুন্দ কি সূর্য্যমুখী? কুন্দ যতদূর যাইতে লাগিল, তাহার প্রেম-শৃঙ্খলের বিস্তার ও ভার ততই বাড়িতে লাগিল। অবলা,

অশক্ত বালা ভ্রমরীর ন্যায় মধুচক্র নগেন্দ্রবাসের চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া হীরার উদ্যানবাসের মধ্যে কিছুকাল অবস্থিত হইলেন।

এখন অপমান, লজ্জা, অভিমান তাহার হৃদয়ে প্রেমের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল "কুন্দের লজ্জা-স্রোতের উপর প্রণয়-স্রোত আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয় প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল। বড় নদীতে ছোট নদী ডুবিয়া গেল। সূর্য্যমুখী-কৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র।"

তখন লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, প্রেমাবেগে তাড়িত হইয়া, কুন্দনন্দিনী একদিন নগেন্দ্রকে দর্শন করিবেন বলিয়া নগেন্দ্রের বৃক্ষবাটিকায় ধীরে ধীরে উপনীত হইলেন। অপমান, লজ্জা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সূর্য্যমুখী যে পতিবিরহ দুই বৎসর সহ্য করিয়াছিল, কুন্দনন্দিনীর প্রেমতরল হৃদয় সেই নগেন্দ্রবিরহ দুইদিন সহ্য করিতে পারিল না।

কুন্দনন্দিনীর হৃদয়-কমল যে কতদূর সৌকুমার্য্যে সুন্দর ছিল তাহা ভাবিতে গেলে, এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসে মন আর্দ্র হইয়া যায়। লজ্জাবতীর কোমলদল যেমন ঈষৎ অঙ্গুলিস্পর্শও সহিতে পারে না, অমনি আকুঞ্চিত হইয়া যায়, কুন্দের হৃদয় তেমনি অত্যল্প আঘাতেও দারুণ ব্যথিত হইয়া পড়ে। সদ্য-প্রস্ফুটিত নবীন

কুসুমে যেমন অঙ্গুলিস্পর্শ করিতেও ভয় হয়, পাছে তাহার নবীনত্ব, সুষমা, ও সৌন্দর্য্যের ঈষৎ ব্যতিক্রম ঘটে, পাছে বর্ণের সে উজ্জ্বলতা ও সৌকুমার্য্যের হানি হয়, পাছে কুসুমের কোমল অঙ্গ কোন খানে ব্যথিত হয়, কুন্দের হৃদয় স্পর্শ করিতেও তেমনি সঙ্কুচিত হইতে হয়। এই হৃদয় যে ঈষৎ স্পর্শ করিতেও ভয় হয়, কমলমণি তাহা একদিন দেখাইয়া ছিলেন। কুন্দ সেই স্পর্শের আঘাতে জলমগ্ন হইতে গিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী তাহা একদিন নিদারুণ স্পর্শ করাতে কুন্দ থর থর কম্পিত কলেবরা হইয়া অনতিবিলম্বে রাত্রিযোগেই বিবাসিনী হইয়া গেলেন। কিন্তু নগেন্দ্র যখন সে হৃদয়ে দারুণ মর্ম্মব্যথা দিলেন, তখন সর্ব্বাপেক্ষা তাহার সৌকুমার্য্য অধিকতর প্রকাশিত হইল। তিনি যেরূপ যৌবনের প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত নগেন্দ্রকে ভালবাসিতেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নগেন্দ্র যখন কুন্দকে ত্যাগ করিয়া সূর্য্যমুখীর জন্য দেশে দেশে ফিরিতে লাগিলেন, তখন কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে নগেন্দ্র-প্রেম স্তম্ভিত হইয়াছিল। নগেন্দ্র যাওয়াতে কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীর জন্য দ্বিগুণ কাতরা হইলেন। এ কাতরতায় একদা অভিমান, ঘৃণা, মমতা, সহানুভূতি প্রভৃতি অনেক ভাব মিশ্রিত ছিল। একদা ঘৃণায় তিনি প্রাণত্যাগিনী হইতে চাহিতেন। স্বামীর অভিমানে তাহার কাতরতা দ্বিগুণ বাড়িত। মমতায় জড়িত হইয়া তিনি সূর্য্যমুখীর জন্য কাঁদিতেন। কিন্তু

এক এক সময়ে নির্জ্জনে তাহার প্রেম উথলিয়া উঠিত। নগেন্দ্রকে দেখিবার জন্য হৃদয় নিতান্ত অধীর হইত। সেই সময়ে এক এক বার নগেন্দ্রের পত্রাবলি পাঠ করিয়া হৃদয়কে দারুণ আবেগে উদ্বেজিত করিতেন। এই উদ্বেজনে এক নিগূঢ় আনন্দ বোধ হইত। তিনি স্বামি-দর্শন লালসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। কতকালে প্রাণনাথকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিবেন, কুন্দনন্দিনী অহর্নিশ তাহাই চিন্তা করিতেন। অবশেষে নগেন্দ্র নিজ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কুন্দ দেখিলেন এখন আর সে নগেন্দ্র নাই। যাহাকে দেখিবার জন্য তিনি এতকাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, সেই নগেন্দ্র আসিয়া একবার তাহাকে চখের দেখাও দেখিল না। কুন্দনন্দিনীর মর্ম্ম-চ্ছেদ হইল। সূর্য্যমুখীর প্রাণসর্ব্বস্ব নগেন্দ্র যখন একবার কুন্দের হইয়াছিলেন, সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগিনী হইয়া সে অভিমান, সে ক্ষোভ নিবারণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু কুন্দনন্দীর নগেন্দ্র যখন সূর্য্যমুখীর হইল, কুন্দনন্দিনী সে অভিমান সহ্য করিতে পারিল না। কুন্দের সুকোমল হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হইল। কুন্দ, যৌবনের দমিত অধীরতায়, নিজ প্রকৃতির অপরিস্ফুটতায় এবং প্রেমের গভীরতায় একদিনে দারুণ মর্ম্মবেদনায় প্রাণত্যাগিনী হইলেন। বিবেচনা কি—সরলা বালা তাহা জানিত না। কুন্দ কেবল প্রকৃতির আবেগেরই অনুসারিণী হইতে জানিত। তাহার প্রেম-সুকুমার হৃদয় যেমন শেলবিদ্ধ

হইল, অমনি তিনি সেই বেদনায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। কুন্দনন্দিনীর এইরূপ জীবিতশেষ তাহার প্রকৃতির উপযোগিনী বটে। যাহারা বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, অন্তরে অন্তরেই গুমরিয়া থাকে, হৃদয় ফাটিয়া গেলেও কেহ জানিতে পারে না, তাহারাই আত্মঘাতিনী হয়। শেলির লজ্জাবতী লতা যেমন তাহার পুষ্প-নারীর আদর বিহনে দুই দিনে বিশুষ্ক হইয়া গেল, কুন্দনন্দিনীও নগেন্দ্রের আদর বিহনে তেমনি একদিনে প্রাণবিয়োগিনী হইল। কুন্দনন্দিনীর এইরূপ পরিশেষ যে কতদূর সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা আমরা এক মুখে বলিতে পারি না। কুন্দনন্দিনী ত মরে নাই, তিনি আমাদিগের হৃদয়ে গৌরবের সহিত পুনর্জ্জীবিতা হইয়া চিরকাল অবস্থান করিবেন। তাহার কোমল স্মৃতি আমাদিগের হৃদয়ে সহানুভূতির সুকুমার শয্যায় অতি কোমল ভাবে চিরদিনের জন্য অবস্থাপিত হইবে। কুন্দ এই পৃথিবীতে একদা এক সুকুমার সুরবালার ন্যায় উদিতা হইয়াছিলেন। এই কঠিন পৃথিবী তাহার উপযোগিনী নহে। এখানে স্বর্গীয় সুষমা ও কোমলতা শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। কুন্দের কোমলতা ও সরলতা সেইরূপ দুই দিনে বিনষ্ট হইয়া গেল। কুন্দনন্দিনী দুই দিন মাত্র উদিতা হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গীয় সৌকুমার্য্য ও সরলতা দেখাইয়া সুকুমার স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

কপালকুণ্ডলা।*

মালতীমাধবের পাঠক মাত্রেরই নিকট কপালকুণ্ডলার নাম অপরিচিত নাই। কিন্তু মালতীমাধব পাঠকের কপালকুণ্ডলার স্মৃতি অত্যল্পই হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে। আজি কালি কপালকুণ্ডলা বলিলে আর মালতীমাধবের ভৈরবীকে মনে পড়ে না। সে কপালকুণ্ডলাকে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে আর এক কপালকুণ্ডলা আমাদিগের মনোমন্দির অধিকার করিয়াছে। তাহা বঙ্কিমবাবুর সৃষ্টি—অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এখন কপালকুণ্ডলার নাম করিবামাত্র এক বনবাসিনী, বন্য, আলুলায়িত-কুন্তলা, প্রকৃতি-মধুরা, সরলা ষোড়শীকে মনে পড়ে। অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য উদাত্ত ভাব মনে সঞ্চারিত হয়। প্রকাণ্ড বন, সমুদ্রতট, ভীষণ কাপালিক, স্থিরসংকল্প নবকুমার সকলই একে একে মনে সমুদিত হইতে থাকে। মনে মনে এখন যে সমস্ত ভাব সঞ্চারিত হইতে থাকে, বঙ্কিমবাবু এই গ্রন্থ মধ্যে যে বিশাল ক্ষেত্র

---

* ভারত-সংস্কারকে "মৃন্ময়ী" নামক গ্রন্থের সমালোচনস্থলে আমি প্রথমে কপালকুণ্ডলা প্রস্তাবের অভাস দিই। এই প্রস্তাব তাহারই পূর্ণবিকাশ মাত্র। ইহা প্রথমে সমালোচন রূপে আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হয়। পাছে অঙ্গভঙ্গ ঘটে এই জন্য আমি ইহাকে সেইরূপেই রাখিয়াছি।

রচনা করিয়াছেন, এবং যে সমস্ত রমণীয় ও ভীষণ দৃশ্যে তাহা পরিশোভিত করিয়াছেন, তাহারই সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য প্রদর্শন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

যে ভূমির উপরে কপালকুণ্ডলার মহান্ চিত্র সকল অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী অনুরূপ মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। বাত্যান্দোলিত মহানদের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তরণী ভাসিয়া যাইতেছে, সমুদ্রতটে নবকুমার একাকী নির্জ্জনদেশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছেন, সমুদ্রতটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিকতাময় পর্ব্বতমালার পার্শ্বে বনস্থলী, বনপ্রান্তে শ্মশান ভূমে কাপালিকের ভয়ঙ্করী তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ, বনমধ্যে পর্ণকুটীর, ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় অমানুষী সুন্দরীর সহসা আবির্ভাব ও তিরোভাব, যেন মেঘমালার মধ্যে সৌদামিনীর আশ্চর্য্য বিকাশ হইতেছে, এবং বন-প্রান্তে নির্জ্জন দেশে পুরাতন দেবমন্দিরের দর্শন, এ সমস্ত দৃশ্যই মনকে উদাত্ত ও গভীর ভাবে পরিপূর্ণ করে। আবার পথিমধ্যে মতিবিবির ঐশ্বর্য্য, আগ্রার সম্রাটের ঐশ্বর্য্য, নবকুমারের গৃহপ্রান্তে বনস্থলী, এবং সেই বন-স্থলীর মধ্যে গভীর রজনীতে, কাপালিক, মতিবিবি এবং কপালকুণ্ডলার ভীষণ মন্ত্রণার জন্য একত্রে সম্মিলন—এক-বার মনে মনে এই সমস্ত আলোচনা করিলে তাহা কি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হয় না? প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু উদাত্ত ও মহান্, পার্থিব মানব ঐশ্বর্য্যের দৃশ্যে যত গৌরব থাকিতে পারে, তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপে যে গাম্ভীর্য্য

থাকিতে পারে, তাহা এই পুস্তকের চিত্রাবলির ক্ষেত্রমধ্যে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান দেখা যায়।

আর এক প্রকার উদাত্ত ভাবেও চিত্রাবলির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে—যে উদাত্তভাবে মানবীয় হৃদয়ের মহত্ত্ব, বীরত্ব অথবা ঔদার্য্যের পরিচয় হয়। প্রকৃতির বিশাল দৃশ্যাবলি দেখিলে যেমন হৃদয় প্রসারিত হয়, মানবের এই ঔদার্য্য এবং মহত্ত্বের পরিচয়েও চিত্ত তেমনি বিস্ফারিত হইতে থাকে। কপালকুণ্ডলার পাঠকের মন এই প্রকার উভয়বিধ মহৎভাবে প্রশস্ত হইতে থাকে। যখন তিনি পান্থনিবাসে "সুন্দরী-সন্দর্শনে" দেখিলেন মতিবিবি নিজ মহার্ঘ অলঙ্কার-রাশি আত্ম-শরীর হইতে উন্মুক্ত করিয়া কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন, তখন কি মতিবিবির ঔদার্য্য গুণে একদা চমকিত হয়েন নাই? যখন কপালকুণ্ডলা শিবিকারোহণে—

——————খুলিয়া সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চি,

অকপট হৃদয়ে ভিক্ষুকের হস্তে সমুদায় সমর্পণ করিলেন, তখন কি ভিক্ষুক আশাতীত ফল লাভ করাতে ক্ষণিক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল না? যখন পাঠক দেখেন লুৎফ-উন্নিসা এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য আগ্রার সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে আসিলেন, যখন দেখেন সেই অনুতাপিতা রমণী নবকুমারের পদতলে

বাহুলতায় চরণ-যুগল বদ্ধ করিয়া কহিতেছেন :—

"নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিও না!"

তখন কি তাঁহার মন একবার মতিবিবির জন্য কাতর হয় নাই? একবার মতিবিবির ত্যাগস্বীকার ভাবিয়া তাঁহার উদারতা গুণে কি তিনি মোহিত হন নাই? আবার যখন নবকুমার বীরের ন্যায় নিজ স্থির সংকল্প রক্ষা করিয়া কহিলেন, "যবনি! তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর," তখন কি পাঠক একবার নবকুমারের মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হয়েন নাই? এরূপস্থলে নবকুমারের ন্যায় মানসিক শক্তির পরিচয় কি সচরাচর ঘটিয়া থাকে? গ্রন্থকার এই প্রকার মানসিক মহত্ত্বের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিয়া গ্রন্থকে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিয়াছেন। যে গ্রন্থের সর্ব্বত্রই উদাত্তভাবে পরিপূর্ণ, তাহা এই প্রকার ধর্ম্মনৈতিক মহত্ত্বের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্তে পরিসমাপ্ত হওয়াতে গ্রন্থের সমধিক গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে। সে দৃষ্টান্তে কপালকুণ্ডলার মহত্ত্ব ও হৃদয়ভাব দেখুন :—

"লু। আমার প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর। কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, 'স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?'

লু। বিদেশে—বহুদূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব, —ধন দিব—দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানস লোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না; অন্তঃকরণ-মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন:—

'তুমি যে আমার উপকার করিয়াছ কি না তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন সম্পত্তি, দাস দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্ন-কারিণীর কোন সম্বাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম আবার বনচর হইব?"

লুৎফ-উন্নিসা চমৎকৃতা হইলেন; এতদূর উদারতায় কে না চমৎকৃত হয়? কপালকুণ্ডলার এই বাক্য কেবল কথাতেই শেষ হয় নাই; তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। কপালকুণ্ডলা পর-সুখের জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন; মানবের উদারতার এই পরাকাষ্ঠা। এই চিত্তৌদার্য্যের দৃষ্টান্তে উপন্যাস পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই পরিসমাপ্তি কিরূপ মধুর তাহা কপালকুণ্ডলার পাঠক-মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। কপালকুণ্ডলা পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া পাঠক মাত্রকেই সন্তাপিত করিয়া

গেলেন। তিনি ত নদীতরঙ্গে মিশিয়া যান নাই, পাঠকের হৃদয়ে নিমজ্জিত হইয়াছেন। পাঠকের মনে চিরকালের জন্য আত্মগুণের একটি স্বুবর্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়াছেন। সে রেখা কখন অপনীত হইবার নহে। তিনি যেন কোন দেবতার ন্যায় নবকুমারের নিকট তাঁহার জীবন রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আবার দেবতার ন্যায় পরকে সুখিনী করিবার জন্য মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার পবিত্রতা তাঁহার রূপরাশিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল, তাঁহার প্রকৃতিকে রমণীয়া করিয়াছিল এবং এক্ষণে তাঁহার স্মৃতিকে পরম মধুরা করিয়াছে। তিনি আজি ও কল্পনার উচ্চদেশে পরম রমণীয় বেশে জীবিতা আছেন। এরূপ একটি রমণীকে সৃষ্টি করাই প্রকৃত কবির সৃষ্টি। কবির সৃষ্টি কল্পনাধামে সুবর্ণ সিংহাসনে চিরকাল জাজ্বল্যমান থাকে। কপালকুণ্ডলা কবির সৃষ্টি, আমরা তাঁহাকে চিরকাল হৃদয়াসনে প্রত্যক্ষ দেখিব। অথবা এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তিনি সেই বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন নবকুমারের উদ্ধার সাধন করিবার জন্য একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিয়া বনদেবীর ন্যায় ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। পথে শিবিকারোহণে ভিক্ষুকের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য সরলা বালা সমুদায় দেহাভরণ সমর্পণ করিতেছেন। শ্যামাসুন্দরীর উপকারার্থ একাকিনী নির্ভীকমনে নৈশকাননে প্রবেশ করিতেছেন এবং

সর্ব্বশেষে পদ্মাবতীর চিরাভিলষিত সিদ্ধ করিবার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া নবকুমারকে চিরকালের জন্য কাঁদাইয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলায় যে কএক খানি প্রধান চিত্রের আলেখ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। কপালকুণ্ডলায় আমরা চারিটি মাত্র প্রধান চিত্রের ছায়া প্রাপ্ত হইয়াছি। ভয়ানক তন্ত্রোপাসক কাপালিক, সম্রাড়ীশ্বরী চতুরা লুৎফউন্নিসা, বনবাসিনী সংসারানভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলা, এবং সচ্চরিত্র অমায়িক নবকুমার। এই চিত্রকতিপয়ের পারিপার্শ্বিক দৃশ্য-সমুদয়ও অতি গভীর ও মনোহর। ভয়ানক কাপালিক, সমুদ্র-তীরস্থ শ্মশানভূমে বনবেষ্টিত এবং শবারোহিত হইয়া যোগ-সিদ্ধি করিতেছে। রূপরাশি, কুন্তলশোভিতা, সংসার-ভূষণ, সরলা, পরহিতার্থিনী কপালকুণ্ডলা,—বনে, পর্ণ-কুটীরে, ভয়ানক কঠোর-হৃদয় কাপালিকের আশ্রমে প্রতিপালিতা ও প্রবৃদ্ধা হইতেছেন। বাঙ্গালিনী, হিন্দু, পতিপরায়ণা পদ্মাবতী, আগ্রার বিলাসধামে যবন-সম্রাটের এবং ওমারাহগণের চিত্ত বিনোদন করিতেছেন। সংসারী নবকুমার, বনে কাপালিকের আশ্রমে, সংসারে বনবাসিনী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে এবং কাপালিকের মন্ত্রণায় নীয়মান হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবকুমার, সম্রাড়ীশ্বরী যবনী সুন্দরী লুৎফ-উন্নিসার পার্শ্বে তৎপ্রার্থিত ও পদসেবিত হইয়া আছেন।

এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে চিত্রগুলিকে বড় চমৎকার শোভায় স্থাপন করিয়াছে। যখন আবার এই চিত্রগুলির পরস্পর-বৈপরীত্য ভাব মনে উদয় হয়, তখন আরও চমৎকৃত হইতে হয়, তখন উপন্যাসের কবিত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে; তখন ভাবিতে থাকি, কেমন চমৎকার কৌশলে কপালকুণ্ডলার উপাখ্যান বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইয়াছে! এই কৌশল হেতু কি কপালকুণ্ডলার সরল উপাখ্যান এত বৃহৎ বোধ হয় এবং সমুদয় হৃদয়-ধামকে পরিপূর্ণ করে? ইহার উপাখ্যান সরল বটে, কিন্তু ইহার ব্যক্তি গুলি ক্ষুদ্র নহে। ইহার বৃহৎ চিত্রগুলি পরস্পর বিপরীত ভাবে সংস্থিত থাকাতে হৃদয়ে দ্বিগুণতর আয়তনে প্রতীত হইতে থাকে। বৈপরীত্যের ফলই এই। বন-বেষ্টিত সমুদ্রতীরস্থ নির্দ্দয় কাপালিক, নগরাশ্রমী অমায়িক নবকুমারের বিপরীত দিকে সংস্থাপিত রহিয়াছে, সুতরাং উভয়েরই চিত্র দ্বিগুণতর ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে। ঐশ্বর্য্য-পরিবেষ্টিতা চতুরা লুৎফ-উন্নিসা, নিরলঙ্কৃতা সরলা কপালকুণ্ডলার অপর পার্শ্বে উজ্জ্বলিত রহিয়াছেন। দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য ও চারুতায় মন স্তম্ভিত ও বিমোহিত হয়। কপালকুণ্ডলা অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহার চিত্র গুলি ক্ষুদ্র নহে; তজ্জন্যই তাহার চিত্রফলক আমাদিগের হৃদয়ে গভীরতররূপে চিরমুদ্রিত রহিয়াছে।

এ গ্রন্থের প্রধান চিত্র—নায়িকা কপালকুণ্ডলা। তাহারই চরিত্র, তাহারই প্রকৃতি বিশেষরূপে প্রদর্শন

করিবার জন্য যাবতীয় ঘটনার আয়োজন ও গ্রন্থীয় কল্পনার সৃষ্টি। আমরা ঋষিকুমারী শকুন্তলাকে দেখিয়াছি—তিনিও জনসমাজ-বিদূরে বনবাসে চিরকাল প্রতিপালিতা। কিন্তু তাঁহার সেই বনবাসেই গৃহস্থের সমস্তই ছিল। অতি উচ্চকুলে শকুন্তলার সমুদ্ভব হয়। সুর-সুন্দরী মেনকা তাঁহার জননী; মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহার জন্মদাতা। মহর্ষি কণ্বের পবিত্র আশ্রমে তাঁহার আবাস। তাপসগণ তাঁহার ভ্রাতৃস্থানীয়, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা তাঁহার সহচরী। মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে অপত্য-নির্বিশেষে লালন পালন করিতেন, সদাই সদুপদেশ দিতেন এবং সদনুষ্ঠানে ব্রতী করিয়া রাখিতেন। ঋষি ও তপস্বিগণের পবিত্র চরিত্র, দয়া ধর্ম্ম, স্নেহ মমতা সকলই শকুন্তলা দর্শন ও শিক্ষা করিতেন। গৌতমী তাঁহাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ও স্নেহ করিতেন। সুতরাং শকুন্তলার বনবাস, বনবাসই নহে। সুতরাং শকুন্তলার প্রকৃতি যে অতি মধুরা হইবে তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বিচিত্র এই, কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি এত মধুরা হইল কেন? তাঁহারই যথার্থ বনবাস ছিল—নির্জ্জন, নির্ম্মম বনবাস। তিনি শকুন্তলার ন্যায় সৎ-কুলোদ্ভবা নহেন। তিনি শকুন্তলার ন্যায় পবিত্র-মহর্ষি হস্তে প্রতিপালিতা নহেন। তিনি একজন নৃশংস তান্ত্রিকের হস্তে প্রতিপালিতা। তান্ত্রিকের নির্দ্দয় ক্রিয়া-কলাপই তাঁহার আদর্শ-স্থানীয়। তথাপি নারী-হৃদয়

নির্দ্দয়-সহবাসেও নিতান্ত কঠোর হইতে পারে নাই। তথাপি কপালকুণ্ডলার হৃদয় কুসুম-সুকুমার ছিল। তাঁহার কোমল দয়াপূর্ণ হৃদয় নবকুমারের জন্য ব্যথিত হইল। তিনি সপত্নীর হিতার্থ পৃথিবীর সকল সুখই পরিত্যাগ করিলেন। তিনি এই দয়ার ব্যবহার কোথায় শিখিলেন? তাঁহার এই হৃদয়-সৌকুমার্য্য তাপস-কুমারী শকুন্তলার হৃদয়-সৌকুমার্য্য অপেক্ষাও গরীয়ান্। কবি, বোধহয়, স্বীয় নায়িকার এইরূপ প্রকৃতি-গৌরব সম্বর্দ্ধনার্থই তাঁহাকে কাপালিকের হস্তে সমর্পণ করিয়া নির্জ্জন বনবাসে সংরক্ষিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু ঠিক তাহাই নহে। একটি অপূর্ব্ব বনবাসিনী রমণীর সৃষ্টি করিবার জন্যই, কবি তাঁহাকে আশৈশব বনবাসে সংরক্ষিত করিয়াছেন। আমরা প্রকৃত বনবাসিনী বালিকার মনে মনে কেবল কল্পনা করিতে পারি। বঙ্কিমবাবু সেই কল্পনাকে জীবিত করিয়াছেন—তাহাকে জীবনের বিষম কার্য্যক্ষেত্রে অবতারণ করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা সেই কল্পনার অবয়ব। আমরা কপালকুণ্ডলাতে দেখিতে পাই, সেই অবয়বী কল্পনা সংসারক্ষেত্রে কিরূপ কার্য্যশীল হয়। আমরা অনেক তাপসকুমারী বনবাসিনীর বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রকৃত বনবাসিনী বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি শকুন্তলা বনবাসে কেমন সংসারিণী ছিলেন। মিরাণ্ডাও পিতার নিকট প্রতিপালিত হইয়া

কিয়ৎ পরিমাণে সংসারিণী ছিলেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কখন সংসারাশ্রমিণী হয়েন নাই। চিরকাল নির্জ্জন বনবাসেই প্রতিপালিতা। তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতিকে প্রকৃত বন্য প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা এতদূর বন্য ছিল যে, সে প্রকৃতি সংসারে প্রবেশ করিয়াও সম্পূর্ণ প্রশমিত হইতে পারে নাই। তাঁহার সংসারানভিজ্ঞতা বরাবর সম্পূর্ণ বর্ত্তমান ছিল। বনত্যাগ করিয়া শিবিকারোহণে নবকুমারের স্বদেশাভিমুখে যাইতেছেন এমত সময়ে কপালকুণ্ডলা "অকপট হৃদয়ে কৌটা সমেত সকল গহনাগুলিন ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কার গুলিনও খুলিয়া দিলেন।" সংসারধামে প্রবেশ করিবামাত্র এই তাঁহার প্রথম কার্য্য—বনবাসিনী বালিকার প্রথম পরিচয়। তাহার বন্য প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিচয় সপ্তগ্রামের অবরোধে শ্যামাসুন্দরীর সহিত সম্ভাষণ সময়ে। সেই দৃশ্যটি কি সুন্দর! কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি-পরিচয়ের কি সুস্পষ্ট উদাহরণ! অবরোধে শ্যামা-সুন্দরীর পার্শ্বে কপালকুণ্ডলাকে স্থাপিতা করিয়া বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলার বন্যপ্রকৃতিকে অধিকতর উজ্জ্বলিত করিয়াছেন। শ্যামাসুন্দরী সংসারাশ্রম-বাসিনীর প্রধান আদর্শস্থানীয় ষোড়শী প্রমোদিনী—বঙ্কিমবাবু একটী মাত্র দৃশ্যে তাঁহার সহিত কপালকুণ্ডলার বৈলক্ষণ্য পরিস্ফুট-রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা এই দৃশ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিয়া দেখাইতে পারি না, বঙ্কিমবাবু কেমন

নিপুণতম চিত্রকরের ন্যায় তাঁহার ছবি সকল অঙ্কিত করেন; কেমন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য সকল কল্পনা করিয়া এরূপ ভাবে কল্পিত চিত্র সকলকে সংস্থিত করেন, যদ্দ্বারা তাহাদিগের প্রকৃতি ও দ্রষ্টব্য গুণাদি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হয়। এই প্রকার সংস্থান সকল কল্পনা করিয়া বঙ্কিমবাবু উপন্যাস রচনায় এত গৌরব লাভ করিয়াছেন। এই প্রকার সংস্থান রচনায় তাঁহার উপাখ্যানকে জীবিত করিয়া তুলে। সে যাহাহউক, নিম্নে সপ্তগ্রামের অবরোধের দৃশ্যটি উদ্ধৃত হইতেছে, পাঠকগণ কপালকুণ্ডলার প্রথম অবরোধ-চিত্র অবলোকন করুন।

"শ্যামাসুন্দরী দুইকরে মৃণ্ময়ীর কেশ-তরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, 'তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না?

মৃণ্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, 'ভাল আমার সাধটি পূরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কতদিন যোগিনী থাকিবে?'

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না!

শ্যা। কেন? দেখিবি? তোর যোগ ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

মৃণ্ময়ী কহিলেন 'না'।

শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোণা হয়।

মৃ। তাতে কি?

শ্যা। মেয়ে মানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস।

মৃণ্ময়ী কহিলেন 'ভাল বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোণা হলেম। চুল বাঁধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম; খোপায় ফুল দিলাম; সিঁথিতে চন্দ্রহার পরিলাম; কাণে ছুল দিলাম; চন্দন, কুঙ্কুম, চূয়া, পান গুয়া, সোণার পুতলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ?'

শ্যা। তবে শুনি দেখি তোমার সুখ কি?

মৃণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন 'বলিতে পারি না। বোধকরি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'

শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে যে মৃণ্ময়ী উপকৃত হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন; কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন 'এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?"

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি?

মৃ। অধিকারী কহিতেন "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া কহিলেন 'যে আজ্ঞা ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল?'

মৃণ্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে?'

শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল কেন?

মৃণ্ময়ী কহিলেন 'শুন। যে দিন স্বামির সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলেম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে আশঙ্কা হইতে লাগিল; ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলেম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না—অতএব কপালে কি আছে জানি না।'

মৃণ্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।"

বঙ্কিমবাবু এক বৎসর কাল কপালকুণ্ডলাকে গৃহিণী করিয়া রাখিলেন। এই এক বৎসরে কপালকুণ্ডলার বন্য প্রকৃতির কিরূপ ঈষৎ প্রশমন হইয়াছিল তাহারই চিত্র উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্যামা-

সুন্দরী সখী—বয়সের সমতা ও প্রকৃতির মধুরতা থাকাতে শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলার সহিত একপ্রাণ, একমন। মনুষ্য সামাজিক জীব। কপালকুণ্ডলা আশৈশব বনবাসিনী থাকিলেও গৃহধামে দুই দিন পদার্পণ করিয়াই শ্যামাসুন্দরীর সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্যামাসুন্দরীর সহিত মিশিয়া এখন আর সে কপালকুণ্ডলা নাই। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়াছে ; "স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে ; এইক্ষণে সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল, ভুজঙ্গের বৃহ্যতুল্য, আগুল্ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে। বেণীরচনারও শিল্পপারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। কেশের যে ভাগ বেণী মধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে শিরোপরি সর্ব্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণ তরঙ্গলেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দ্ধ লুক্কায়িত নহে ; জ্যোতির্ম্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে। দুই কর্ণে হেম কর্ণভূষা দুলিতেছে ; কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে।" এখন আর সমুদ্রতীরস্থ আলুলায়িত কুন্তলা ভূষণহীনা কপালকুণ্ডলা নাই। গৃহধামে তাঁহার এই সমস্ত পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে শ্যামাসুন্দরী কেশ বাঁধিতে চাহিলে কপালকুণ্ডলা তাঁহার

হাত হইতে কেশ গুলিন টানিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব্বে সকল কথায় 'ইহাতে কি সুখ' 'উহাতে কি হইবে' এইরূপ উত্তর করিয়া সংসারের অনভিজ্ঞতার কেমন স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। এখন আর ততদূর অনভিজ্ঞতা নাই, ততদূর বন্যভাব নাই। কিন্তু যে কপালকুণ্ডলা চিরকাল বনবাসিনী থাকিয়া স্বাধীনভাবে বনে বনে নির্ভীকমনে বিহার করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাঁহার সেই বন্য প্রকৃতি কি এক বৎসরের অল্পকাল মধ্যে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইতে পারে? আজিও সম্মুখস্থ নিবিড় কানন দেখিলে তাঁহার সেই সমুদ্রতীরস্থ বনাশ্রম সমুদয় মনে পড়িতে থাকে। আর এক এক বার ইচ্ছা হয় সেইরূপ স্বাধীনভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কাপালিকের নিকট স্বাধীন ও নিঃশঙ্কভাবে থাকিয়া তাঁহার প্রকৃতিতে কেমন এক প্রকার নিরঙ্কুশ সাহসিকতা জন্মিয়াছিল, যাহা তাঁহার গর্ব্বিত বচনে ও নির্ভীক ব্যবহারে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইত। তিনি শ্যামা-সুন্দরীর নিকট বলিতেন, "যদি আমি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।" নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলার সহিত রজনীতে বনে অনুগামী হইতে চাহিলেন কপালকুণ্ডলা অমনি গর্ব্বিত বচনে বলিলেন, "আইস আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও" নবকুমার তাঁহার এই গর্ব্বে পরাজিত হইয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

আর একবার তাঁহার বন্য প্রকৃতি প্রবলা হইয়া উঠিল। তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে একাকিনী বনদেবীর ন্যায় নির্ভয়ে রজনীযোগে নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবা মাত্র জ্যোৎস্নালোকে বনমধ্যে পূর্ব্বকার স্মৃতি সমুদায় উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি আর একবার সেই সমুদ্রতীরস্থ স্বাধীন, বনবাসিনী কপাল-কুণ্ডলা বলিয়া আপনাকে ভাবিতে লাগিলেন। বনমধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিলেন। সংসার সমুদায় ভুলিয়া গেলেন, শ্যামাসুন্দরীকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার ঔষধি উন্মূলিত হইল না। সম্মুখে অগ্নিবিভা দেখিয়া পূর্ব্বকার বনাশ্রম মনে পড়িল। কৌতূহল-পরায়ণা কপাল-কুণ্ডলা সেই আলোকের অভিমুখীন হইতে লাগিলেন। দেখিলেন বনমধ্যে কুটীর। তন্মধ্যে কাপালিকের ন্যায় কে যেন কাহার সহিত গম্ভীর ভাবে কথা কহিতেছে। কপালকুণ্ডলা আর একবার প্রকৃষ্টরূপে বনবাসিনী হইয়া গেলেন। তিনি নবকুমারের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু প্রবেশ করিয়াও আর সংসারিণী হইতে পারিলেন না। শ্যামাসুন্দরীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়াও শ্যামা-সুন্দরীকে ভুলিলেন, নবকুমারকে ভুলিলেন। তিনি সমুদ্র, কানন, কাপালিক, ও কালীমূর্ত্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগি-লেন। স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন "যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগর হৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত; তাহাতে বসন্ত-রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে;

নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধা শ্যামের অনন্ত প্রণয় গীত গাইতেছে। পশ্চিম গগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে। আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণ বৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণ মেঘ সকল কোথায় গেল। নিবিড় নীল কাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক্ নিরূপণ হয় না। নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন্ দিকে বাহিবে স্থিরতা পায় না। বাতাস উঠিল; বৃক্ষ-প্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তরঙ্গ মধ্য হইতে এক জন জটাজুটধারী প্রকাণ্ডাকার পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বামহস্তে তুলিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল।" কপালকুণ্ডলা এই স্বপ্ন মধ্যে ভক্তবৎসলা ভবানীর আবির্ভাব দেখিলেন। গৃহে আছেন, বনেরই কথা মনে মনে আলোচনা করিতেছেন। রজনী হইলেই বনে যান, আবার আসেন। এখন কে তাঁহাকে গৃহস্থ-কন্যা বলিবে? এক বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়াছি এক বৎসর পরেও আবার সেই কপালকুণ্ডলাকে দেখিলাম। গৃহধামে এক বৎসরে তাঁহার অল্পই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু এই কপালকুণ্ডলাকে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি এই বনদেবীর চিত্র এই খানে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আর এ চিত্র ধরেন নাই, বোধ হয় ধরিতে পারিবেন না।

ধরিতে পারিবেন না?—না, ধরিলে ভাল দেখায় না। ইহার পর কপালকুণ্ডলার জীবনে আর অধিক ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত নহে। কপালকুণ্ডলার জীবনে যতদিন ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত ছিল, ততদিন বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে ঔপন্যাসিক পাত্রী রূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর কপালকুণ্ডলা ক্রমশঃ গৃহিণী হইতে থাকিবেন। ঔপন্যাসিক ঘটনায় তাঁহার জীবন-স্রোত আর অধিক তরঙ্গিত হইতে পারিবে না। ইহার পর কপালকুণ্ডলার জীবনে যে অত্যল্প ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত হইতে পারে, সে ভাবের সহিত তদীয় পূর্ব্বকার জীবনের গাম্ভীর্য্য সমতুল্য হইবে না। এজন্য বঙ্কিমবাবু আর এ চিত্র ধরিতে সাহসী হন নাই। বঙ্কিমবাবুর সে কার্য্য নহে। স্থির বাস্তবিক ভাব চিত্রিত করা বঙ্কিমবাবুর কার্য্য নহে। ঔপন্যাসিকভাব বিরহিত হইলে, জীবনস্রোত যেরূপ স্থিরভাবে প্রবাহিত ও মন্দ মন্দ হিল্লোলিত হইতে থাকে, সে জীবন-স্রোত চিত্রিত করা বঙ্কিমবাবুর কার্য্য নহে। বঙ্কিমবাবু কখন স্থির জীবনের চিত্র ধরিতে যাইবেন না, যাইলে তাহাকে তরঙ্গ-মালায় বিক্ষোভিত করিয়া ঔপন্যাসিকভাবে পূর্ণ করিয়া লইবেন। কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ জীবন-প্রবাহে ভীষণ তরঙ্গ-লীলা আর সম্ভাবিত নহে বলিয়া, পরের কার্য্য পরের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।*

* "মৃণ্ময়ী"র লেখক এ চিত্রের কিছুই করিতে পারেন নাই; ভারতসংস্কারকে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা ঠিক উপন্যাসযোগ্যা পাত্রী। তাঁহার কল্পনায় যতদূর ঔপন্যাসিক ভাব সম্ভাবিত হইয়াছে কোন গৃহস্থ নারীর কল্পনায় ততদূর সম্ভাবিত নহে। তাঁহার বন্যপ্রকৃতি সংসারানভিজ্ঞতার উপযোগিনী এবং তাঁহার স্বাধীনতা বন্যপ্রকৃতির উপযোগী। এই স্বাধীনতা, বন্যভাব, ও একান্ত সংসারানভিজ্ঞতা হেতু তাহার প্রকৃতিকে উপন্যাসের প্রকৃত উপযোগিনী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কোন বনবাসিনী ঋষিকুমারীর প্রকৃতিতেও এসমস্ত ভাবের একাধারে সম্মিলন দেখিনা। কারণ, ঋষিকুমারীর প্রকৃতি আশ্রমনিবাসে কথঞ্চিৎ প্রদমিত, প্রশান্ত, ও পরিণিয়মিত হইয়া আইসে। ঋষির আশ্রমনিবাসেও সংসারের অনেক ভাব বিদ্যমান থাকে। সেখানে স্বাধীন প্রকৃতি উদ্দাম ভাবে কার্য্য করিতে পারে না; ক্রমশঃ অধীনতায় নীয়মান ও বিনম্র হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদিগের কপালকুণ্ডলার আশ্রমে সেরূপ শিক্ষা ও বিনিয়ম কিছুই বিদ্যমান ছিল না। কাপালিকের আশ্রম ঋষির আশ্রম নহে। তাহা একজন তান্ত্রিকের যোগসাধনের ও বীভৎস ব্যাপার সম্পন্ন করিবার নিভৃত বনালয় মাত্র। কাপালিক ঋষি ছিলেন না, তিনি কপালকুণ্ডলাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে ঋষির মত প্রতিপালন করেন নাই। তাঁহার যে প্রকার ভয়ানক উদ্দেশ্য ছিল তাহাতে কপালকুণ্ডলা কেবল বনমধ্যে আবদ্ধা থাকিয়া ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধা হইতে থাকিবেন, এই পর্য্যন্তই

আবশ্যক ছিল। সেই প্রয়োজনমত কপালকুণ্ডলাও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বনমধ্যে প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন। কোন শিক্ষা ও উপদেশ তাঁহার প্রকৃতিকে নিয়মিত করে নাই, কোন সাধু এবং সদনুষ্ঠানের দৃষ্টান্তে তাঁহার প্রকৃতি উন্নত হয় নাই, সংসারধামের কোন স্নেহময় ব্যবহারে তাঁহার প্রকৃতি বিনম্র হয় নাই। তিনি প্রকৃতির হস্তে প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে স্বভাবতঃই যে কোমলতা ও সরলতা ছিল তাহাই ক্রমশঃ স্বতঃই প্রস্ফুরিত হইতেছিল। সেই কোমলতা হেতু তিনি নব-কুমারের উদ্ধারসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। নহিলে তাঁহার প্রকৃতির স্বাধীনতা ও বন্যভাব দমন করিবার কিছুই ছিল না। তিনি সংসারধামের কোন আদর্শই কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই *। এই প্রকার রমণীর কল্পনা নিশ্চয় উপন্যাসোপযোগী। এ প্রকার রমণীকে কাল্পনিক কার্য্যক্ষেত্রে যথেচ্ছা আনিতে পারা যায় এবং যে প্রকারে বিচালিত করা যাউক না কেন, তাহাতে কল্পনার অসামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই কপালকুণ্ডলা এক বৎসর কাল সংসারিণী হইয়াও যে প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়াই উপলব্ধি হয়। অথচ তাহাতে উপন্যাস-সুলভ যেরূপ স্বাধীন ও সরল ভাব বিদ্যমান আছে তাহা

* অধিকারী যে প্রকৃষ্টরূপে সংসারী ছিলেন, এবং তাহার গৃহে যে কপালকুণ্ডলা সর্ব্বদা থাকিত, গ্রন্থে এমত প্রকাশ নাই।

সংসারিণী কোন নারীরই উপযোগী হইত না। শ্যামা-সুন্দরী সেরূপ স্বাধীন ও সরল ভাবে কার্য্য করিতে কেন সাহসিনী হন নাই? শ্যামাসুন্দরীরই স্বার্থ, তাহারই ইষ্টসিদ্ধির জন্য কপালকুণ্ডলা নিতান্ত বিব্রত হইয়া বনে গেলেন। অথচ শ্যামাসুন্দরী গৃহে বসিয়া রহিলেন। এই জন্য বলি কপালকুণ্ডলা সম্পূর্ণ উপন্যাসযোগ্যা পাত্রী।

আর এক কারণে কপালকুণ্ডলা আমাদিগের হৃদয়-গ্রাহিণী হইয়াছেন। কপালকুণ্ডলার দুঃখ ও দুর্ভাগ্য। শৈশবেই তিনি অনাথিনী রূপে বনালয়ে পরিত্যক্তা হয়েন। আমরা তাঁহাকে প্রথমে কাপালিকের আশ্রমে দর্শন করি। দর্শন করিয়া যখন তাঁহাকে বনদেবীর ন্যায় নবকুমারের উদ্ধার সাধনে সচেষ্টিতা দেখি, তখন বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদিগের সে আনন্দ পরক্ষণেই নিরানন্দে পরিণত হইল। যখন শুনিলাম তিনি কাপা-লিকের কি দুরভিলষিত সিদ্ধির জন্য বনবাসে আবদ্ধা আছেন তখন আমাদিগের হৃদয় অমনি কপালকুণ্ডলার দুরদৃষ্টের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। শুদ্ধ নবকুমারের উদ্ধার সাধন নয়, কপালকুণ্ডলার উদ্ধার সাধন জন্যও আমরা ব্যাকুল হইলাম। অধিকারীকে শতবার ধন্যবাদ দিলাম; তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতা ঋণে বিক্রীত হই-লাম। নবকুমার আমাদিগের সাধন হইলেন। কপাল-কুণ্ডলাকে লইয়া নবকুমারের সহিত পলায়ন করিতেছি,

আর শতবার পশ্চাদ্ভাগে চাহিতেছি পাছে কাপালিক অনুগামী হইয়া থাকে। আশঙ্কায় ও আনন্দে হৃদয় যুগপৎ উদ্বেলিত হইতেছিল। একবার কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের গৃহে আনিতে পারিলে হয়। আনিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সুখ তিরোহিত হইল। কপালকুণ্ডলা ম্রিয়মাণা, কপালকুণ্ডলা সুখিনী নহেন, কাহার জন্য তবে সুখী হইব? ভক্তবৎসলা ভবানী কপালকুণ্ডলার ত্রিপত্র ধারণ করেন নাই। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিয়া সেই জন্য কপালকুণ্ডলা নিতান্ত শঙ্কিত থাকেন। আমরাও ভাবি কপালকুণ্ডলার ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না। কাপালিক কি কুচক্র করিয়া কখন তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করে এই ভাবনায় অনুদিন চিন্তাকুল থাকি। সেই কাপালিক দেখি সপ্তগ্রামে উপস্থিত। আমরা অমনি ভয়ে অস্থির হইলাম। তাহার কুচক্রে নবকুমার পতিত হইলেন, নবকুমারের প্রতি রাগান্ধ হইলাম। কপালকুণ্ডলা প্রেতভূমে আনীত হইলেন। আমরা কপালকুণ্ডলার দুঃখে একেবারে বিহ্বল হইলাম। জলোচ্ছ্বাসে কপালকুণ্ডলা কোথায় অদৃশ্যা হইলেন। অমনি ইচ্ছা হইল জলে ঝম্প দিয়া পড়ি। কপালকুণ্ডলার উদ্ধার সাধন করিয়া আনন্দে কূলে উঠি।

মানবের জন্য মানবের হৃদয় এইরূপ কাঁদিয়া উঠে। যাহার জন্য হৃদয় কাঁদে, তাহাকে যেন আপনার বলিয়া

জ্ঞান হইতে থাকে। কপালকুণ্ডলাকে এই জন্য আপনার বলিয়া জ্ঞান হয়। তাঁহার দুঃখে আমাদিগের নয়ন অশ্রু-ধারায় পূর্ণ হইয়াছে। অজ্ঞাতসারে নয়নাম্বু বিগলিত হইয়াছে। আমরা তাঁহাকে নিতান্ত আপনার ও প্রিয় জ্ঞান করিয়াছি। দুঃখ-রাশির যতই বৃদ্ধি হইয়াছে ততই তাঁহাকে অধিকতর আপনার জ্ঞান হইয়াছে। তাঁহার দুঃখরাশি মোচন করিবার জন্য আমাদিগের যে কোন উপায় ছিল না, এই আমাদিগের দুঃখ, এই আমাদিগের একান্ত ক্ষোভের বিষয়।

দুঃখ-পূর্ণ উপন্যাস-পাঠের এই কুফল। নায়িকার ইতিহাস দুঃখপূর্ণ না করিলে সে নায়িকা কখন পাঠকের হৃদয়গ্রাহিণী হয় না; পাঠকের অনুকম্পার ভাজন না হইলে, কেহ তাঁহার হৃদয় হরণ করিতে পারে না; তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু যখন এক জনকে আপনার বলিয়া জ্ঞান হইল, তাহার সুখ দুঃখ আপন ভাগ্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল, এবং তাহার সুখ দুঃখে নিতান্ত অধীর হইতে লাগিলাম, তখন তাহাকে দুঃখে ও বিপদে নিপতিত দেখিলে কি স্থির থাকিতে পারা যায়? বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে আপনার প্রিয়জনের অকল্যাণ বিমোচনের জন্য যেরূপ উদ্যোগী ও উন্মত্ত হইতে হয়, কাল্পনিক প্রিয়জনের অমঙ্গল দেখিলে কি তদ্রূপ হইতে ইচ্ছা হয় না? কল্পনা ও হৃদয় উভয় পক্ষেই সমভাবে ব্যথিত ও উদ্বোধিত হইয়া উঠে। তবে প্রভেদ এই,

উপন্যাসে আমাদিগের চেষ্টা অগত্যা অবরুদ্ধ হইয়া যায়, আমাদিগের কার্য্যশক্তি উত্তেজিত হইয়া আপনা আপনি নিবৃত্ত হইয়া পড়ে। উভয় পক্ষেই শোণিত সমভাবে উষ্ণ হইয়া উঠে। বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে সেই শোণিতের তেজ কার্য্যে পরিণত হয়—মানবজীবন সার্থক হয়। কিন্তু উপন্যাসের কাল্পনিক ক্ষেত্রের দোষ এই, সেখানে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে পরের উপকারার্থ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিলেও কার্য্য করিবার কিছুই ক্ষমতা নাই। শতবার এইরূপ কার্য্যশক্তি অগত্যা নিবৃত্ত হইলে, তাহা আর উত্তেজিত হইতে চাহে না। হৃদয় ক্রমশঃ কঠিন হইতে থাকে। শোণিত উত্তপ্ত হইতে চাহে না; উত্তপ্ত হইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ শীতল হইয়া পড়ে। কার্য্যশক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আইসে। উদ্যোগ একেবারে চির-নিদ্রায় অভিভুত হয়; বৃথায় কল্পনাকে শতবার ব্যথিত করিবার এই দোষ। সর্ব্বদা দুঃখ-পূর্ণ উপন্যাসপাঠের এই বিষময় ফল। যিনি সর্ব্বদা এই প্রকার উপন্যাস পাঠ করেন তাহার হৃদয় ক্রমশঃ শীতল হইয়া আইসে; তিনি ক্রমশঃ উদ্যোগ বিরহিত হইয়া পড়েন। প্রয়োজন কালে সংসারের বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে অনেক সময় নিরুদ্যোগী দেখা যায়।

কপালকুণ্ডলার দুঃখের জন্যই কপালকুণ্ডলা আমা-দিগের নিকট এত প্রিয়তম হইয়াছেন। তিনি আমা-দিগের হৃদয়ের সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার দুঃখ

ভাবিয়া আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্য ভুলিয়া যাই, তাঁহার রূপ যৌবন সকলই ভুলিয়া যাই। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দুঃখের ছায়ায় পবিত্র জ্ঞান হয়। তাঁহার প্রতি চাহিলেই আমরা বিষণ্ণ হই। কোন অপবিত্র ভাব আমাদিগের হৃদয় স্পর্শ করে না। হৃদয়ের-বিষাদ মন্দিরে তাঁহার দেবমূর্ত্তি স্থাপিত দেখি। তাঁহার বিমলিন মুখচন্দ্রমা যেন রাহুগ্রস্ত, ছায়াবিবর্ণিত, বিকম্পিত শশধরের ন্যায় প্রতীত হইতে থাকে। তাঁহার শান্ত মুখচ্ছবি, যেন কুজ্ঝটিকার অবগুণ্ঠনাবৃত প্রভাবিরহিত রক্তিম সূর্য্যমূর্ত্তির ন্যায় জ্ঞান হইতে থাকে। তাঁহার দুঃখরাশি তাঁহার মুখমণ্ডলে ছায়া প্রদান করিয়াছে। সেই দুঃখ-রাশির মধ্য হইতে তিনি অতি পবিত্র শান্ত মূর্ত্তিতে আমাদিগের মনে গভীর-ভাবে সমুদিত হন। তাঁহাকে দেখিলে শান্তির স্নিগ্ধমূর্ত্তি মনে উদয় হয়। তখন মনে অতি পবিত্র শান্ত ভাবের উদয় হয়। অনেকক্ষণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখা যায় না। নয়ন পৃথিবীর দিকে নীয়মান হয়। মনে কি যেন ভাবনার উদয় হইতে থাকে। যেন দেবমূর্ত্তির সমক্ষে দণ্ডায়মান আছি। আবার সেই স্নিগ্ধমূর্ত্তির প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করি, নয়ন শীতল হয়। কারণ, সে মূর্ত্তিতে উজ্জ্বল বিভা কিছুই নাই। ঐ দেখ আলুলায়িত-কেশমণ্ডল-সমাবৃত বিমলিন মুখচন্দ্রমা অতি স্নিগ্ধভাবে একদা আমাদিগের প্রতি, একদা ঊর্দ্ধদিকে ভক্তবৎসলা ভবানীর প্রতি ছল্ ছল্ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। উহার মুখমণ্ডলে

যেন ভাবনা মূর্ত্তিমতী হইয়া আছে। কপালকুণ্ডলার এই শান্ত মূর্ত্তি দেখিলে কি মনে গভীর রসের সঞ্চার হয় না? বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলাকে এইরূপ দুঃখ-সমাবৃতা করিয়া তাঁহার মূর্ত্তিকে আরও বিমোহিনী করিয়াছেন; কপালকুণ্ডলার ন্যায় গভীর-রস-সঞ্চারিত উপন্যাসক্ষেত্রে উপযোগী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এইরূপ দুঃখ-সমাবৃতা থাকাতেই কপালকুণ্ডলাকে অতি উচ্চ ও উদাত্ত ভাবে পরিপূর্ণ দেখায়।

অনেক বয়সে কপালকুণ্ডলা সংসারে প্রবেশ করিলেন। অনেক বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি স্বভাব-হস্তে নবীন ও হরিৎ রহিয়াছে। সংসারের সুখদুঃখ ও প্রমোদ কিছুই জানেন না। কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা কিছুই জানেন না। পতি, ভার্য্যার কি অমূল্য পদার্থ তাহাও কিছুই জানেন না। কিরূপ ব্যবহারে লোকের সন্তোষ ও অসন্তোষ উৎ-পাদিত হয় তাহাও কিছুই জানেন না। কোন বিষয়ের জ্ঞান তাঁহার কিছুই নাই। অরণ্য-কুমারীর এপ্রকার জ্ঞান থাকিবার কথাও নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয় আছে, সরল হৃদয়—যাহা রমণীগণের প্রধান সম্পত্তি। সেই হৃদয় লইয়া তিনি সংসারে প্রবেশ করিলেন। সেই হৃদয় লইয়া তিনি অপরিচিত নবকুমারের সহিত বিদেশে আসিলেন। প্রণয় কিরূপ তাহা তিনি জানিতেন না। হৃদয়ে অনুরাগ মাত্রের সঞ্চার হইতেছিল। নবকুমার

সেই নবমুকুলিত অনুরাগের পাত্র হইলেন। সরলতা বশতঃ তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে শ্যামা-সুন্দরীর প্রতি, কিয়ৎ পরিমাণে নবকুমারের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু সে অনুরাগ আজিও এত প্রবল হয় নাই, যে তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারের আবেগ সকল প্রদমিত করিতে পারে। আজিও ভক্তিবৎসলা ভবানীর প্রতি কপালকুণ্ডলার শৈশব-ভক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। আজিও সাংসারিকতা এত প্রবল হয় নাই, যে পরদুঃখকাতরা কপালকুণ্ডলা পরহিতে নিরত হইবেন না। আজিও প্রণয় এত প্রবল হয় নাই, যে লুৎফ-উন্নিসার সুখের জন্য সে প্রণয় বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কুচিত হইবেন। কপাল-কুণ্ডলার হৃদয়ে আশৈশব যে সমস্ত ভাবের উন্মেষ হইয়াছিল সে সমস্ত ভাব এত দুর্ব্বল নহে, যে বৎসরেক সংসার বাসে তাহা নবোদিত প্রণয়ের আবেগে পরাভূত হইবে। কারণ, সেই সমস্ত ভাবই কপালকুণ্ডলার একমাত্র সম্পত্তি ছিল। সেই কতিপয় ভাবেই কপালকুণ্ডলা জীবিত। কপালকুণ্ডলা পৃথিবীর আর কিছুই জানিতেন না, কেবল বালস্বভাবসুলভ ভক্তি, ভয়, ও পরদুঃখে কাতরতা জানিতেন। তিনি পূর্ব্বে যাহা কিছু করিতেন, ইহা-দিগেরই অন্যতম ভাবে প্রণোদিত হইয়া করিতেন। এই ভাবত্রয় তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব ছিল। পৃথিবীর জ্ঞান-বিরহিত হওয়াতে অন্যভাবে তিনি কখন বিচলিত হয়েন নাই। সুতরাং এই ভাবত্রয়ই শনৈঃ শনৈঃ প্রবল

হইয়াছিল। ঈষৎ অনুরাগ মাত্র কি তাহাদিগকে সহসা বিদূরিত করিতে পারে?

এই সংসারানভিজ্ঞা সরলা নব-প্রণয়িনী কপালকুণ্ডলার সহিত, ঘোর-বিষয়িণী চতুরা প্রেমবৃদ্ধা লুৎফ-উন্নিসার কেমন সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ভাব! কপালকুণ্ডলা সরলতায় গৌরবান্বিতা, লুৎফ-উন্নিসা গৌরবের ভগ্নাবশেষ। কপালকুণ্ডলা নবোদিত পূর্ণচন্দ্রমা, লুৎফ-উন্নিসা হ্রস্বতেজ অস্তগামী সূর্য্য। একজন জীবন-পথে হৃদয়ালোক সহ স্নিগ্ধমূর্ত্তিতে উদিত হইতেছেন, অন্য জন হৃদয়-তেজ সঙ্কীর্ণ করিয়া জীবন পথে এক প্রকার অস্তগামী হইতেছেন। অস্তাচলে অধোগামী হইয়া মনে করিতেছেন আবার উদয়াচলে নববিভায় সমুজ্জ্বলিত হইবেন, চন্দ্রমাকে শীঘ্র বিদূরিত করিয়া দিবেন। কাপালিক এমত সময়ে সন্ধ্যাগগনে ঘটনাজালের মেঘ আনিয়া দিল; ঝড় উঠিল। মেঘমণ্ডলী গগন দেশে ব্যাপ্ত হইল। চন্দ্র ডুবিল, সূর্য্যও অদৃশ্য হইল। সকলই মেঘময়, কিছুই দৃষ্ট হয় না; নবকুমার কেবল চন্দ্র-সন্নিকট ঐ তারকা মাত্র রূপে একাকী মেঘপার্শ্বে অস্পষ্ট ঝল্ ঝল্ করিতেছেন। ইহাই কপালকুণ্ডলার সমাপ্তি—মহান্ সমাপ্তি। এই গগনদেশে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার মন না গভীর ভাবে পূর্ণ হয়? বাহ্য-মেঘাড়ম্বর ও অন্ধকার কাহার মনে না প্রবেশ করে? কে না চন্দ্রমালোকের অভাব জ্ঞান করেন? এই গম্ভীর সমাপ্তি—এই গম্ভীর

দৃশ্য কপালকুণ্ডলার ন্যায় গম্ভীর উপন্যাসের উপযুক্ত বটে। আমরা এ দৃশ্য কথনই ভুলিব না। আমাদিগের মন এ দৃশ্যে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কে আবার মেঘ-মালাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে! চন্দ্রমা কবে মেঘোন্মুক্ত হইয়া স্নিগ্ধ কিরণে অমৃত বর্ষণ করিবেন! বোধ হয় সে চন্দ্রমাকে দেখা আর আমাদিগের অদৃষ্টে নাই। সেই জন্যই আমরা চন্দ্রমার অভাবে এত বিহ্বল হইয়াছি। কেবল কল্পনাতে তাহার পূর্ণ মূর্ত্তি এখনও প্রভাসিত রহিয়াছে।

কপালকুণ্ডলার বিমোহিনী দেবমূর্ত্তি বঙ্কিমবাবু এরূপ কৌশলে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যদ্দ্বারা সেই রূপের গাম্ভীর্য্য ও গৌরব বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে; নবকুমার নিরাশ হইয়া একাকী সমুদ্রকূলে অন্য-মনে বসিয়া আছেন এমত সময় প্রদোষ-তিমির আসিয়া সাগরের কাল জলের উপর ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাহারও মন সহস্র ভাবনার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। পৃথিবী তমোময়, মনও তমোময়; এমত সময়ে সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। অমনি সহসা তাহার তমসাচ্ছন্ন মনে যেন সৌদামিনী-রেখা প্রভাসিত হইল। "নবকুমার, অকস্মাৎ সেই দুর্গম মধ্যে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দ-শরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল; স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।" যিনি নবকুমারের অবস্থায় সমুদ্রের জনহীন

তীরে প্রদোষ-সমাগমে কখন এরূপ দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব দেখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই সে মূর্ত্তির মোহিনী শক্তি অনুভূত করিতে পারেন না। তখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের নিকট আশার প্রদীপ রূপে উদিত হইলেন। তাঁহার দেবমূর্ত্তিতে যে সৌন্দর্য্য ছিল তাহা পাঠক সহানুভূতি হেতু নবকুমারের অবস্থায় পতিত হইয়া অবলোকন করেন, সুতরাং তাঁহার দেবমূর্ত্তি দ্বিগুণ শোভায় প্রতীত হইতে থাকে।

কিন্তু আর এক স্থলে বঙ্কিম বাবু অধিকতর কৌশলে কপালকুণ্ডলার রূপের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি প্রথমে মতিবিবির রূপ পাঠকের নিকট বর্ণনা করিলেন; মতিবিবিকে সুন্দরী সাজাইলেন। তাহার সৌন্দর্য্যপ্রভা অলঙ্কার-রাশিতে বর্দ্ধিত করিলেন। যে বিমোহিনী রূপে মতিবিবি সম্রাটেরও মনোহরণ করিয়াছিলেন, বঙ্কিমবাবু তাহাকে একবার সেইরূপে লোকলোচনের সমক্ষে প্রদর্শন করিলেন। এই সম্রাড়ীশ্বরী সুন্দরীর রূপে পাঠকের মন মোহিত হইল। বঙ্কিম বাবু তখন সেই সুন্দরীকে কপালকুণ্ডলার নিকট লইয়া গেলেন। কপালকুণ্ডলা বন্য বেশে পান্থনিবাসের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। তিনি সবে মাত্র বন হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার রূপ স্বভাবহস্তে এখনও নবীন অথচ সরল ও অপরিষ্কৃত রহিয়াছে। সেই বন্য প্রকৃতি-সুন্দরীর নিকট পৃথিবীর অলোকসামান্য সুন্দরী উপস্থিত হইলেন।

সম্রাড়ীশ্বরী আত্মরূপের গরিমায় পরিপূর্ণ। তিনি জানিতেন আমি অসামান্য সুন্দরী। বঙ্কিমবাবু সেই রাজপ্রাসাদের গর্ব্বিতা সুন্দরীকে আনিয়া সরলা বন-বাসিনী বালিকাকে দেখাইলেন। রাজেশ্বরী বনবাসিনীকে দেখিবামাত্র চমৎকৃতা হইলেন। কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। "ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপাল-কুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন মতিবিবির পূর্ব্বকার হাসি হাসি ভাব দূর হইল; অনিমিক্ লোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন নাঃ— মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা। মতিবিবি নীরবে পরাজিতা হইলেন, কপালকুণ্ডলা নীরবে অলোকসামান্যা সুন্দরীর উপর জয়ী হইলেন। রাজোদ্যানের পারিজাত-সুন্দরী বনশোভিনীর নিকট পরাজিতা হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা সে জয় বুঝিতে পারিলেন না। মতিবিবি বুঝিলেন আর পাঠক বুঝিলেন। পাঠক নীরবে বুঝিলেন, কপালকুণ্ডলা রাজরাজেশ্বরী অপেক্ষাও রূপবতী। নহিলে ক্ষণেক পরে মতি কেন "আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন।" তখন নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি করিতেছ?' মতি কহিলেন 'দেখুন না।' মতি আত্ম-শরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন 'ও কি হইতেছে?' মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।

"অলঙ্কার-সমাবেশ সমাপ্ত হইলে, মতি নবকুমারকে কহিলেন, 'আপনি সত্য বলিয়াছিলেন, এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না। পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাইতে পারিলাম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম। আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন।"

রমণী সহজে অন্য রমণীর রূপের প্রশংসা করে না। মতিবিবি আবার সুন্দরী—আগ্রার রাজেশ্বরী, আত্মরূপ-গর্ব্বে গর্ব্বিতা। সেই মতিবিবি কপালকুণ্ডলার সরল রূপলাবণ্য দেখিয়া চমৎকৃতা হইতেছেন এবং পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্ম-অলঙ্কার রাশি সেই বরাঙ্গেরই উপযুক্ত বলিয়া পরাইতেছেন। এই দৃশ্যটি কি সুন্দর, কেমন নীরব, সরস, অর্থপূর্ণ ভাবোদ্দীপক চিত্র! এই নীরব চিত্রে কপালকুণ্ডলার রূপ যেমন উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইল, সহস্র বর্ণনায় তাহা হইতে পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু এই নীরব চিত্রের আর একটি গুরুতর অর্থ আছে। সে অর্থ মতিবিবির বর্ত্তমান হৃদয়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে প্রকাশিত হইবে। এই হৃদয়ভাব পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব বঙ্কিমবাবু মতিবিবিকে উপন্যাস মধ্যে কি সাজে সাজাইয়াছেন।

লুৎফ-উন্নিসা আপন বুদ্ধি ও রূপবলে একদা আগ্রার রাজেশ্বরী হইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে বেগমের সখী বটে, কিন্তু পরোক্ষে যুবরাজ সেলিমের হৃদয় সম্পূর্ণ

অধিকার করিয়াছিলেন। ওমরাহ এবং রাজ্ঞী প্রভৃতি সম্রাটের অন্যান্য পারিপার্শ্বিকগণের ষড়যন্ত্রের তিনি মর্ম্ম ভেদ করিয়া কৌশল পূর্ব্বক সেলিমের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। "সেলিমের চিত্তে তাহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল যে লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাহার পাটরাণী হইবেন ইহা তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল।" তিনি একদা পৃথিবীর অতি নীচতম প্রদেশে অবস্থিত ছিলেন। রূপ ও গুণবলে তাহার আকাঙ্ক্ষা ও পদের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি সেই পৃথিবীর অতি উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবেন বলিয়া মনে মনে কত আশা ও কত কল্পনাই পোষণ করিয়াছিলেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইলেই তিনি সকল সাধ পূর্ণ করিবেন। তাহার হৃদয়াকাশে আশার শত চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। তিনি আনন্দের জ্যোৎস্নায় ভাসিতেছিলেন, এমত সময়ে সহসা তাহার হৃদয়াকাশের এক কোণ হইতে এক খানি ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র মেঘ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে কাদম্বিনীজাল প্রসারিত হইল। জ্যোৎস্না ডুবিল। সেলিম একদা মেহের-উন্নিসাকে দেখিয়াছিলেন। সেলিমের মনে আর এক চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। একই গগনে দুই চন্দ্রের উদয় কখনই সম্ভব নহে, লুৎফ-উন্নিসা তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। মহতী আশার বিস্তারিত স্বপ্ন হইতে সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আলোক-সুন্দরী কমলিনী প্রস্ফুটিত হইবার

উপক্রম হইতেছে, তাহা দেখিয়া যামিনী-সুন্দরী কুমুদিনী কাজেই মুদিতা হইতে লাগিলেন। ভ্রমর কমলিনীর আশায় কুমুদিনীকে ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল। যে পর্য্যন্ত আকবরসাহ বর্ত্তমান, লুৎফ-উন্নিসা বুঝিলেন সেই পর্য্যন্ত ভ্রমর কমলিনীতে বসিতে পারিবে না। একবার সেলিম সিংহাসনে আরূঢ় হইলেই মেহের-উন্নিসা তাহারই হইবে। সম্রাটের ইচ্ছার কে প্রতিরোধ করিবে? লুৎফ-উন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেন। আশার উচ্চ শৃঙ্গ হইতে তাহার হৃদয় ভূপতিত হইল। হৃদয়দর্পণ ভাঙ্গিয়া গেল, ভাঙ্গিয়া শতধা হইল। নৈরাশ্য শতগুণ বাড়াইবার জন্যই যেন, শতধা দর্পণ হইতে পূর্ব্বকার উচ্চাভিলাষের পুত্তলি শতরূপী হইয়া একবার দেখা দিল। লুৎফ-উন্নিসা আর একবার বহুকাল-পোষিত উচ্চাশাকে আণুবীক্ষণিক চক্ষে দর্শন করিলেন। নৈরাশ্য দ্বিগুণিত হইয়া হৃদয়বেদনার বৃদ্ধি করিল। ক্রমশঃ নৈরাশ্য চিত্তময় হইল। হৃদয় কালীময় হইল। আবার নৈরাশ্যের বেদনা ক্রমে কমিতে লাগিল। মানবের মন কখন চিরকাল নৈরাশ্যকে পোষণ করে না। আবার আশাদেশে চাহিতে থাকে। ঘোর নৈরাশ্য হইতেও আশা সমুদ্ভূত হয়। লুৎফ-উন্নিসা আবার আশাকে মনে স্থান দিলেন। তাহার মনে অন্য আকাঙ্ক্ষা উদিত হইল। পূর্ব্বকার পাপাচরণে ঘৃণা জন্মিল, রাজভোগে ঘৃণা জন্মিল। ভাবিলেন "যদি রাজপুরী মধ্যে সামান্য পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে হইল,

তবে প্রতিপুষ্প-বিহারিণী মধুকরীর পক্ষচ্ছেদ করিয়া কি সুখ হইল? যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখী মেহের-উন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ? তাহার অপেক্ষা কোন প্রধান রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়।”

লুৎফ-উন্নিসার মনে এই প্রতিঘাত হইল। তিনি গৃহস্থের স্থির সুখের প্রত্যাশিনী হইলেন। এইরূপ প্রতিঘাত স্বাভাবিক। আকাঙ্ক্ষার অত্যুচ্চ শিখর হইতে পতিত হইলে প্রবৃত্তির স্বাভাবিকই এইরূপ প্রতিঘাত জন্মে। এই প্রকার প্রতিঘাত বশতঃ অনেকে সংসারে বিরাগী হইয়া একেবারে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের লুৎফ-উন্নিসা কখন সংসারিণী হন নাই। তিনি চিরকাল দুশ্চারিণী হইয়াছিলেন। এই জন্য পাপাচারে ঘৃণা জন্মিয়া একবার সংসারিণী হইতে তাহার নিতান্ত বাসনা হইল।

এই বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য তিনি উপায় দেখিতে লাগিলেন। কৌশলময়ী লুৎফ-উন্নিসা কখন উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থা নহেন। তিনি একটি কল্পনা স্থির করিলেন। বেগমকে কল্পনায় প্রবৃত্ত করিলেন। প্রবৃত্ত করাইয়া দেখুন কৌশলপূর্ব্বক কেমন প্ররোচন বাক্যে আপনারই কথা বেগমের মুখ দিয়া ধীরে ধীরে বাহির করিয়া লইতেছেন!

লু।—“আপনার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইব, কিন্তু

এক আশঙ্কা পাছে সিংহাসন আরোহণ করিয়া খস্রু এ দুশ্চারিণীকে পুরবহিষ্কৃত করিয়া দেন।”

”বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন, “তুমি আগ্রার যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমার স্বামী পঞ্চহাজারি মন্সবদার হইবেন।”

“লুৎফ-উন্নিসা সন্তুষ্টা হইলেন। ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল’’ এই উদ্দেশ্য সাধনজন্য তিনি যে উপায়াবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার হৃদয়ের আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে। সেলিম যে তাহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহারও প্রতিশোধ সাধিত হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনকালে নবকুমারের সহিত ঘটনাক্রমে তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি নবকুমারের পরিচয়ে জানিলেন নবকুমার তাহার স্বামী। জানিলেন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের নববিবাহিতা পত্নী। জানিলেন নবকুমার এত কালের পর আবার পাণিগ্রহণ করিলেন।

সহসা তিনি এই সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তাহার হৃদয় মন তখন অন্য ভাবে বিচলিত ছিল। একটি প্রকাণ্ড ব্যাপারের ঘোর ঘটনাজাল ও পরিণাম তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি তাহারই জন্য বিব্রত হইয়া আগ্রার রাজভোগ ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ

করিতেছিলেন। পথিমধ্যে অনতিকালপূর্ব্বের দুর্ঘটনাও তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি এই দুর্ঘটনাকেও সেই বৃহৎ কাণ্ডের আনুষঙ্গিক ঘটনা বলিয়া সহিষ্ণুতার সহিত তাহা বহন করিয়া যাইতেছিলেন। এমত সময় অকস্মাৎ তাহার স্বামীকে ও কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হৃদয়কে অধিক বিচলিত করিতে পারিল না। লুৎফ-উন্নিসা কি করিলেন? কেবল কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে চাহিলেন। স্বাভাবিক কৌতূহল-পরতন্ত্র হইয়া, তিনি আত্মস্থানীয় নবকুমার-পত্নীকে কেবল দেখিতে চাহিলেন। সুন্দরীকে দেখিব—সে কেবল ব্যপদেশ মাত্র। সেই ব্যপদেশে তিনি স্বীয় সপত্নীকে দেখিতে চাহিলেন। গিয়া কপালকুণ্ডলার রূপ দেখিয়া একেবারে চমৎকৃতা হইলেন। তখন তাহার মনে সপত্নীর ভাব কিছুই উদয় হয় নাই। তিনি নবকুমারকে সম্পূর্ণ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে সময় পান নাই। তখন তাহার হৃদয়ে অস্পষ্ট জ্ঞান ছিল, ইহাঁরা সকলেই পর হইয়া গিয়াছেন। তিনি যবনী হইয়া ওমরাহ-গণের বিলাসিনী হইয়াছেন। নবকুমারের সহিত তাহার দূরতা বিলক্ষণ অনুভব হইতেছিল। তিনি নবকুমারকে গ্রহণ করিতে যাইবেন—সে ভাব এখনও মনে উদয় হয় নাই। সুতরাং তিনি কপালকুণ্ডলাকে সপত্নী বলিয়া ভাবিতে পারেন নাই। সুতরাং কপালকুণ্ডলার সম্মুখীন হইয়া তিনি তাঁহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার

করিয়া ছিলেন তাহা নিতান্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সে ব্যবহারে যে কবিত্ব আছে তাহাকেবলস্বভাবজ্ঞ ব্যক্তিরই উপলব্ধি হইবে।

বঙ্কিমবাবু অপেক্ষা ন্যূনতর স্বভাবজ্ঞ কবির হস্তে, লুৎফ-উন্নিসা এই স্থানে হয় ত অন্যবিধ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু জানিতেন লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় উচ্চাশয়ে ক্রমশঃ এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, কোন ক্ষুদ্র পদার্থ সে হৃদয়ে হিংসার উদ্রেক করিতে পারে না। ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিলে সে হৃদয়ে বরং অনুকম্পার সঞ্চার হইতে পারে, তদ্দ্বারা তাহা কখন অধিকৃত হইতে পারে না। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় এখন এই রূপ ছিল। সুতরাং নবকুমারের ব্রাহ্মণী তাহার হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। তিনি তজ্জন্য অবিচলিত চিত্তে কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে যাইলেন। ক্ষণিক দেখিয়া মন কিছু বিচলিত হইল। দেখিলেন কপালকুণ্ডলা সুন্দরী—নবকুমার যেরূপ পত্নী হারাইয়াছেন, তদপেক্ষাও বরাঙ্গিণীকে লাভ করিয়াছেন। দেখিয়া মনে মনে একবার কথঞ্চিৎ আত্মীয়তা ও অঙ্গাঙ্গী ভাবের সঞ্চার হইল। কপালকুণ্ডলাকে সপত্নীভাবে না দেখিয়া ভগিনী ভাবে দেখিলেন। সপত্নী ভাবে দেখিবেন,—ততদূর সাহসিনী হন নাই, ততদূর আত্মীয়তাভাব এখনও মনে স্থান পায় নাই। তাহার মনে,—কেউ যেন আপনার আপনার—এই পর্য্যন্তই অস্পষ্ট জ্ঞান হইতে-

ছিল। এই জ্ঞানে ভগিনীর সুন্দর অঙ্গে, অনায়াসলব্ধ অলঙ্কার রাশি পরাইতে তাহার মনে মনে বড় সাধ হইল। পরাইয়া সে সাধ মিটাইলেন। হৃদয়ের আত্মীয়তা ভাবের পরিতৃপ্তি সাধন করিলেন। কারণ, লুৎফ-উন্নিসা কখন হৃদয়ভাব দমন করিতে শিখেন নাই। নবকুমারের কাছে থাকিলে তিনি নিজে যে সাজে সাজিতেন, কপাল-কুণ্ডলাকে একবার সেই সাজে সাজাইয়া দেখিলেন। নবকুমারের কাছে ব্রাহ্মণী হইয়া থাকিলেও তাহার উচ্চাশা যে বহুমূল্য অলঙ্কারদামে শোভিতা হইয়া থাকিত, কপালকুণ্ডলাকে একবার সেই অলঙ্কারে শোভিতা করিয়া কল্পনায় তৎস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবি-লেন আমিও এইরূপ সাজিতাম। অপর্যাপ্ত অলঙ্কার আছে বলিয়া আপনার ভগিনীর অঙ্গ হইতে সে অলঙ্কার রাশি মোচন করিতে আর ইচ্ছা হইল না। প্রকাশ্যে নবকুমারকে কহিলেন, "এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম।" নবকুমার তাহাই বুঝিলেন। আবার যখন মতিবিবি বলিলেন ঃ— "আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন"—তখন একেবারে মতিবিবির হৃদয়-কাব্য বিকশিত হইয়া পড়িল। নবকুমার সে কাব্যের একটি ভাবও তখন বুঝিতে পারিলেন না।

লুৎফ-উন্নিসা একেবারে সকল আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বহুকাল ধরিয়া যে আশা

হৃদয়ে পোষিত থাকে, তাহা শীঘ্র হৃদয়-মন্দির পরিত্যাগ করিতে চাহে না। থাকিয়া থাকিয়া আবার সেই আশা মনে উদিত হয়। লুৎফ-উন্নিসা ভাবিয়াছিলেন, যদি জাহাঙ্গীর মেহের-উন্নিসাকে না পান, তবে আমাকেই গ্রহণ করিবেন। জাহাঙ্গীর তখন মেহের-উন্নিসাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু মেহের-উন্নিসার মন কি জাহাঙ্গীরের প্রতি প্রলুব্ধ আছে? তিনি মেহের-উন্নিসার প্রকৃতি বিলক্ষণ জানিতেন। জানিতেন যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঙ্গীরের প্রতি অনুরাগিণী না থাকেন, তবে জাহাঙ্গীর কিছুতেই মেহের-উন্নিসাকে লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব একবার মেহের-উন্নিসার মন পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই রূপ কৃতসংকল্প হইয়া তিনি বর্দ্ধমানাভিমুখে মেহের-উন্নিসার নিকট যাইতেছিলেন। নবকুমারের সহিত পরিচয়ের পর তিনি আবার সেই বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার পূর্ব্বানুরাগ কিছু শিথিল হইতেছিল। আর একটি প্রিয়তর ভাব মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। প্রণয়-ভাজনের সহিত তাহার অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তখনকার প্রণয়সঞ্চারের বিষয় বিশেষ জানিতে পারেন নাই; কিন্তু তখনই বীজ রোপিত হইয়া রহিল। অসাক্ষাতে নবকুমারের মুখমণ্ডল তাহার মনে পড়িতে লাগিল। "স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে

অঙ্কুর জন্মিল।” তিনি পথিমধ্যে নির্জ্জনে সন্ধ্যার সময় চটীতে বসিয়া আছেন আর নবকুমারকে ভাবিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে অন্য-মনে সহসা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

“পেষমন! আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে? সুন্দর পুরুষ বটে কি না?”

সমগ্র ওমরাহমণ্ডলী মধ্যে যাহার কাহাকেও সুন্দর পুরুষ বলিয়া মনে ধরে নাই, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাহার আজি সুন্দর পুরুষ বলিয়া মনে ধরিয়াছিল। প্রণয় ও আত্মীয়তা এইরূপ প্রণয়ভাজন ও স্বজনের মুখচ্ছবিকে অনুরঞ্জিত করিয়া দেখায়। লুৎফ-উন্নিসা নবকুমারকে সুন্দর দেখিলেন। হৃদয়ভঙ্গ-জনিত নৈরাশ্যের পর প্রেমের প্রতিঘাত জন্মিল। কিন্তু এখনও এ প্রতিঘাত অতি মৃদু ও দুর্ব্বল। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে এতকালের পর প্রেম প্রবেশ করিবার উপক্রম হইতেছে। তিনি যে পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন কোন ভদ্র ব্যক্তির সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়, এক্ষণে সেই ভদ্র ব্যক্তি কে, স্থির করিলেন। ভাবিলেন যদি আমার স্বামীই সেই ব্যক্তি হন তবে বড় সৌভাগ্যের বিষয় বটে। কিন্তু সে পথে অনেক অন্তরায় আছে, এখন স্বামীকে লাভ করা বড় সুসাধ্য নহে। একবার বর্দ্ধমান দেখিয়া আসা উচিত, পরে নবকুমারের কথা। এই জন্য তিনি বর্দ্ধমানে আসিলেন। যাইয়া মেহের-উন্নিসার হৃদয়-কবাট কৌশল পূর্ব্বক উন্মুক্ত

করিয়া দেখিলেন তথায় জাহাঙ্গীরের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। মেহের-উন্নিসা কহিল ঃ—" জাহাঙ্গীর সিংহাসনে—আমি কোথায় ?" লুৎফ-উন্নিসা মনে মনে উত্তর করিলেন, তুমিও সিংহাসনে যাইবে। লুৎফ-উন্নিসা বুঝিলেন, যতদিনে হউক স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হইবে। যতদিনে হউক হীরক, গলকন্দার তিমিরময় খনি হইতে উন্মুক্ত হইয়া রাজমুকুটের শিরোভূষণ হইবে। যতদিনে হউক মেহের-উন্নিসার উজ্জ্বলরূপ দিল্লীর সিংহাসনে প্রভাসিত হইবে। আর কেন সে সিংহাসনের জন্য আশা ? লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় কথঞ্চিৎ উঠিয়াছিল, এক্ষণে প্রবল বেগে আর একবার নিপতিত হইল। তিনি এই বারে মনে মনে সকল আশা বিসর্জ্জন দিলেন। "কিন্তু তাহাতে কি মতিবিবি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্ত-প্রসাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।"

বুঝিলেন তাহার হৃদয়ে নবকুমারের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তিনি সিংহাসন লইয়া কি করিবেন ? "দিল্লীর সিংহাসন-লালসাও তাহার নিকট লঘু হইল।" তিনি নবকুমারের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। "দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল।" তিনি রাজা,

রাজধানী, রাজ-সিংহাসন সকলই বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইলেন। রাজসিংহাসন অপেক্ষাও হৃদয়ের প্রেম-প্রতিমাকে অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যে হৃদয় পূর্ব্বে পাষাণবৎ ছিল, যে হৃদয় সেলিমের "রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখন মুগ্ধ" করিতে পারে নাই, এখন সেই পাষাণ মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। কীট প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে নবকুমারের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিল। লুৎফ-উন্নিসা সেই প্রতিমূর্ত্তির চরণতলে রাজসিংহাসন বিক্ষেপ করিয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

আগ্রায় উপনীত হইয়া লুৎফ-উন্নিসা দেখিলেন এখন আর সে আগ্রা নাই। সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই। সকলই পরিবর্ত্তন, সকলই বিরূপ। এখন রাজ-প্রাসাদে ক্ষণিক অবস্থান করিতেও তাহার হৃদয়ে যেন শেল-বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি ত্বরায় জাহাঙ্গীরের নিকট বিদায় লইলেন। জাহাঙ্গীরও কণ্টক কাটিলেন। তখন লুৎফ-উন্নিসা, যেখানে হৃদয় গিয়াছে, সেই খানে যাইতে লাগিলেন। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে এখন ঘোর প্রতিঘাত জন্মিয়াছে—প্রেমের দিকে। নৈরাশ্যের পর প্রেম-প্রতিঘাত জন্মিলে হৃদয়ের ভাব কিরূপ হয়, লুৎফ-উন্নিসায় বঙ্কিমবাবু তাহারই চিত্র প্রক্ষেপণ করিয়াছেন। এই প্রেম-প্রতিঘাত যিনি বুঝিতে পারিবেন তিনিই লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় কবাটের চাবি পাইয়াছেন। এই হৃদয়-প্রতিঘাত জন্য লুৎফ-উন্নিসাকে এত পবিত্র জ্ঞান হয়। হৃদয়-প্রতিঘাত

বারবিলাসিনীকেও পবিত্র করে; কারণ, ইহা মানব-প্রকৃতির গৌরব। ইহাতে মানব প্রকৃতিকে দেবতুল্য পবিত্র করিয়া তুলে। ত্রিবেণীর জল ইহারই জন্য পবিত্র হইয়াছে। গঙ্গা ভগীরথের সহিত সাগরাভিমুখে যাইতে যাইতে একবার ত্রিশূলীকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ হইবা-মাত্র একবার হিমালয়ের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। শুদ্ধ ফিরিয়া চাহিলেন না, দুই পদ অগ্রসরও হইলেন। ত্রিবেণী পবিত্র হইয়া গেল। গঙ্গার হৃদয়-স্রোত প্রতিঘাত পাইয়া ত্রিধারায় প্রবাহিত হইল। সেই ত্রিধারাধারিণী ত্রিবেণী তীর্থস্থান হইল। এই খানেই গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাতে ত্রিবেণী পবিত্র হইয়াছে, তাহা লুৎফ-উন্নিসাকেও পবিত্র করিয়াছে। পবিত্র হইয়া পাপময় সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা এক্ষণে কুটীরে যাইতেছেন। সম্রাটের প্রতি পাদবিক্ষেপ করিয়া তিনি একজন সামান্য ব্যক্তির পদরেণুর প্রত্যাশিনী হইয়াছেন। পৃথিবীর প্রলোভন-পূর্ণ রত্ন-ভূষিত পাপময় বিলাসধামকে হেয় জ্ঞান করিয়া তিনি এক্ষণে সংসারীর নির্ম্মল-সুখ-পূর্ণ ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। তিনি এখন হিন্দু পতি-পরায়ণা পদ্মাবতী হইয়াছেন। হিন্দুরমণীর পতি-পরায়ণতা তাহার মনে জাগরিত হইয়াছে। এখন নবকুমারকে তিনি আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। সেই আপনার স্বামীর জন্য তাহার হৃদয় প্রবল বেগে আকৃষ্ট হইয়াছে। ভাবিতেছেন পৃথিবীর সকলই পর;

একবার আপনার স্বামীর নিকটে গিয়া হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াইবেন। আপনার স্বামী পরভোগ্য হইয়া রহিয়াছেন, তাহা এখন তাহার অসহ্য বোধ হইতেছে। যে প্রকারে হউক, আপনার ধনকে আপনার করিয়া লইবেন, এই আশয়ে লুৎফ-উন্নিসা এখন প্রবল হৃদয়বেগে নবকুমারের পানে ধাবিত হইতেছেন। তিনি বিলাসিনীর সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, বড় সাধ, একবার সাংসারিক সুখে সুখিনী হইবেন।

কপালকুণ্ডলাও সংসারে নূতন প্রবেশ করিতেছেন। একজন বনবাস হইতে সংসারে প্রবেশ করিতেছেন, অন্য জন সংসারের বহির্দেশে বহুকাল উদ্ভ্রান্ত হইয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছেন। দুই জনেই জানেন না সংসারে কি সুখ। বনবাসিনী সে সুখের কখন আস্বাদ পান নাই, বারবিলাসিনীও সাংসারিক সুখে কখন সুখিনী হন নাই। এইখানেই দুই জনে সমান, কিন্তু আর কিছুতেই সমান নহেন। তাহাদিগের এ সাদৃশ্য কেবল প্রতারণা মাত্র। কপালকুণ্ডলা ঠিক সংসারে প্রবেশ করিতেছেন না, সংসার নিজে তাহার নিকট উপস্থিত। সংসার তাহাকে পবিত্রা জ্ঞানে সংসারিণী করিতে চাহে। লুৎফ-উন্নিসার ভাব সেরূপ নহে। লুৎফ-উন্নিসা যেন কোন মরুদেশ হইতে মৃগতৃষ্ণিকায় তৃষ্ণাতুরা হইয়া কুরঙ্গিণীর ন্যায় সংসারের দিকে ধাবিত হইতেছেন। তিনি সংসারকে চাহেন, কিন্তু সংসার তাহাকে চাহে

না। তিনি নিজ ইচ্ছায় সংসারে প্রবেশ করিতেছেন, কপালকুণ্ডলা ঘটনাক্রমে সংসারে প্রবিষ্টা হইয়া পড়িলেন। সংসার কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু চির-বনবাসিনী কখন সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিবার নহে। তিনি ত্বরায় সে পিঞ্জর ভঙ্গ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা পতিপ্রেমে দৃঢ়-অনুরাগিণী ও পবিত্রা হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন, সংসার তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহে না; কারণ, সংসার এখনও তত পরিশুদ্ধ ও উন্নত হয় নাই। এই খানে আমরা একদা সংসারের নীচতা এবং লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ভাবের উচ্চতা সুস্পষ্ট উপলব্ধ করি। লুৎফ-উন্নিসার পবিত্র হৃদয়ভাব ও প্রগাঢ় অনুরাগকে অশ্রদ্ধা করিতে আমাদিগের অণুমাত্র ইচ্ছা হয় না। তন্মধ্যে মানব-প্রকৃতির যে উচ্চতা ও গৌরব উপলব্ধ হয় তাহা সংসারে বড় দুর্লভ। সেরূপ প্রগাঢ়-অনুরাগিণী রমণী-মণ্ডলীর রত্ন-স্বরূপ। বিশেষতঃ যে রমণী পাপ-পথ হইতে ঘৃণায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া এইরূপ পরিশুদ্ধ প্রেম-পথে পদার্পণ করিতেছেন—এইরূপ দৃঢ় অনুরাগের সহিত একান্ত মনে পতির শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতে যাইতেছেন, সে রমণীতে যে স্বেচ্ছাকৃত দৃঢ় পতি-পরায়ণতা ও পবিত্রতা আছে, তাহা সংসারের জড়ভাবাপন্ন পাতিব্রত্য ও সঙ্কীর্ণ পবিত্রতা হইতে নিশ্চয় গরীয়ান্। সংসার অন্যূন এতদূর উন্নত হওয়া চাই, যেন সে প্রকার পবিত্রতার গৌরব বুঝিতে পারে। লুৎফ-উন্নিসাকে যখন সংসার

গ্রহণ করিল না, তখন আমরা লুৎফ-উন্নিসার জন্য নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন করিলাম; সংসারকে ধিক্কার দিলাম। সংসার লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ভাবের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিল না। শুদ্ধ লুৎফ-উন্নিসার জন্য ক্রন্দন করিলাম না—একবার সমগ্র রমণী জাতির দুরবস্থা ভাবিয়া ক্রন্দন করিলাম। ভাবিলাম, লুৎফ-উন্নিসা যদি পুরুষজাতীয় হইতেন, আজি সংসার কি তাহাকে সহজে পরিত্যাগ করিত? লুৎফ-উন্নিসার সমাবস্থ রমণী-রত্নকে পরিত্যাগ করিতে কেমন হৃদয়বেদনা উপস্থিত হয় তাহাই দেখাইবার জন্যই যেন কবি, তাহাকে প্রেমের পূত বারিতে পবিত্র করিয়া সংসারের নিকট আনিয়া দিলেন, আনিয়া দিয়া যেন কহিলেন:—দেখ সংসার! তুমি এত নীচ হইও না, যে আমার অনুতাপিনী লুৎফ-উন্নিসাকে পরিত্যাগ কর। নীচ সংসার তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিল। পরিত্যাগ করাতে কি হইল?—লুৎফ-উন্নিসারই গৌরব-বৃদ্ধি হইল। যিনি একান্ত মনে সংসারের শরণাপন্ন হইলেন, সেই সংসারের এমন সহৃদয়তা নাই, যে শরণাপন্নকে গ্রহণ করিয়া লয়। সেই নীচ সংসার মানবের ন্যায় পাপ-পুণ্যময় প্রাণীর বাসযোগ্য নয়। অথবা রমণীজাতি কোন উচ্চতর সংসারের উপযোগিনী। লুৎফ-উন্নিসার দৃষ্টান্তে আমরা কি শিক্ষা পাই? আমরা শিক্ষা পাই, সংসারের পবিত্রতাভাব, মানব-প্রকৃতির পবিত্রতার অনুসারী হওয়া চাই। সংসারের

পবিত্রতা যেন অস্বাভাবিক না হয়। সে পবিত্রতা অস্বাভাবিক হইলে,অনেক লুৎফ-উন্নিসার স্বাভাবিক ভাব বিধ্বংস হইবে। অনেক অনুতাপিনী, অস্বাভাবিক পাপ-পথে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জিতা হইবেন। তাহাদিগের আর উদ্ধারের পথ নাই। পৃথিবীতে পাপিনীর পুণ্যবতী হইবার উপায় নাই। অতএব সংসারের ধর্ম্ম-নিয়ম অস্বাভাবিক। তাহা মানবের স্বভাব অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যাহা অস্বাভাবিক, তাহা ধর্ম্ম-নিয়ম নহে। যে ধর্ম্ম-নিয়ম পাপীকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ, তাহা মানব-সমাজে ধর্ম্ম-নিয়ম বলিয়া প্রচলিত থাকা নিতান্ত অনুচিত। ধর্ম্ম-নিয়ম যদি মানব-প্রকৃতির গৌরবের অনুসারী না হয়, সে ধর্ম্ম-নিয়ম পরিত্যাজ্য। সে ধর্ম্ম-নিয়ম পরিত্যাজ্য, তথাপি লুৎফ-উন্নিসা পরিত্যাজ্যা নহে। নবকুমার যখন লুৎফ-উন্নিসাকে গ্রহণ করিলেন না, তখন লুৎফ-উন্নিসা যেন এই সমস্ত উদ্বোধন বাক্যে সংসারকে উপদেশ দিলেন।

লুৎফ-উন্নিসার এই হৃদয়-প্রতিঘাতে একটী ধর্ম্মোপদেশ নিহিত আছে। সে ধর্ম্মোপদেশ যদিও সামান্য, কিন্তু বঙ্কিমবাবু তাহা এরূপ উদ্দীপক বাক্য-পরম্পরায় এবং উপযুক্ত অবসরে সেই রমণীরত্নের মুখ দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন যে তাহা নিতান্ত পুরাতন হইলেও আমরা আর একবার লুৎফ-উন্নিসার দৃষ্টান্তে শিক্ষিত হই। তাহার হৃদয়ের অনুতাপে আর একবার গলিয়া যাই।

আর একবার পাপ-পথে ঘৃণা জন্মে। ঘৃণা জন্মে কেন? লুৎফ-উন্নিসার জীবিত ও দগ্ধীভূত হৃদয়ের অনুতাপ দেখিয়া। বোধ হয় তাহার হৃদয় যেন অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, সুবর্ণপ্রায় উজ্জ্বলিত বিভায় ধর্ম্ম-জীবনে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। তাহার হৃদয়-প্রতিঘাত তদীয় হৃদয়ে এই অনুতাপ আনিয়াছে। এই দেখুন সেই অনুতাপ-পাবকে তাহার হৃদয় কেমন বিগলিত হইয়া পবিত্র হইতেছে!

"অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফল লাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবলা ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তি জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশে এতদূর করিলাম তাহার কোন্‌টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, সকলই তো পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ করিলাম। যে ইন্দ্রিয়ের জন্য আর সকল ভোগই বিসর্জ্জন করিতে পারি, সে ইন্দ্রিয়ও অবাধে পরিতুষ্ট করিয়াছি। এত করিয়াও কি হইল? আজি এই খানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, একদিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্ত জন্যও কখন সুখভোগ করি নাই—কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি,

কিন্তু কি জন্যে? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন একদিনের তরেও সুখী হইতাম।"

"তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখন আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরা ধমনী-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই?"

এই অনুতাপ-বাক্য-পরম্পরায় মতিবিবির হৃদয়-ভাব কেমন স্ফটিকবৎ প্রতীত হইতেছে! তাহার এই অনুতাপ দেখিয়া আমাদিগেরও ইন্দ্রিয়সুখে বিতৃষ্ণা জন্মে। আমরা ভাবি, যিনি মতিবিবির ন্যায় বিলাসপথে আশার উচ্চ শৃঙ্গে উঠিতে যাইবেন, তাহাকে এক দিন মতিবিবির ন্যায় অবশ্য কাঁদিতে হইবে। তিনি সম্পদ ও গৌরবের আস্পদ হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিবেন। পাপ-পথে যে কিছুই সুখ নাই, মতিবিবি তাহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

মতিবিবি এই পাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য-পথে যাইলেন। সে কার্য্যের পরিণাম পাঠকের অবিদিত নাই। কিন্তু মতিবিবি একবার যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন তিনি সে পথ সহজে পরিত্যাগ করিবার

পাত্রী নহেন। নবকুমার তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু তিনি সহজে নবকুমারকে ছাড়িবার নহেন। তিনি নবকুমারের জন্য আগ্রার সমুদায় ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন। বিসর্জ্জন দিয়া যে সংকল্পে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার তিনি একশেষ না করিয়া কখনই ছাড়িবেন না। তাহার চরিত্রে এই অটল অধ্যবসায় ও উদ্যোগ সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান। তিনি আগ্রার সিংহাসনও সহজে ছাড়েন নাই। সেই সিংহাসনের আকাঙ্ক্ষিনী হইয়া তাহা লাভার্থ কখন যত্নের ক্রটি করেন নাই। যাহা ধরিতেন তাহাতে সিদ্ধ হইবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেন—এই তাহার চরিত্রের একটী অমূল্য গুণ। বুদ্ধিমতী ও কৌশলময়ী মতিবিবি সম্পূর্ণ উদ্যোগিনীও ছিলেন।

কপালকুণ্ডলার উপাখ্যানে এই মতিবিবির চিত্র যেমন উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, এমন কাহারই নহে। মতিবিবির চিত্র সুস্পষ্ট উজ্জ্বল, কপালকুণ্ডলার চিত্র অস্পষ্ট মলিন। একের চিত্রে উজ্জ্বলতা আছে, অন্যের চিত্রে মৃদু মাধুরী আছে। একের চিত্রে সরলতা আছে, অন্যের চিত্রে বৈচিত্র্য আছে। মতিবিবি প্রভাময়ী, কপালকুণ্ডলা মুগ্ধকরী। মতিবিবির চিত্রে তুলিকা-রেখা বর্ণগৌরবে অলক্ষিত, কপালকুণ্ডলার চিত্র কতিপয় সরল রেখায় অঙ্কিত। মতিবিবি আমাদিগের মনে পূর্ণ-বিভায় অঙ্কিত হয়েন, কপালকুণ্ডলা আমাদিগের মনে ছায়ারূপে বিচলিত হইয়া বেড়ান। মতিবিবি কল্পনায় স্থির থাকেন,

কপালকুণ্ডলা চঞ্চলভাবে এক এক বার কল্পনাকে যেন বিমুগ্ধ করিয়া উদিত হয়েন। মতিবিবিকে কল্পনা স্থির-নয়নে দেখিতে পারে, তাহার চিত্র সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারে, তাহাকে আঁকিতে সাহসী হয়; কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে গিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহার চিত্র সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারে না, লিখিতে সাহস হয় না। একজন পার্থিব, অন্য জন কাল্পনিক। একজন মূর্ত্তিময়ী, অন্য জন ভাবময়ী। মতিবিবিকে এই জন্য অনেক সম্পূর্ণ দেখায়, কপালকুণ্ডলাকে এই জন্য অনেক অসম্পূর্ণ দেখায়। মতিবিবি সুনিপুণ চিত্রকরের মূর্ত্তি, কপালকুণ্ডলা কবির কল্পনাময়ী মূর্ত্তি। মতিবিবিকে কবি চিত্র করিয়াছেন, কপালকুণ্ডলাকে কবি কল্পনা করিয়াছেন। মতিবিবি কল্পনাকে পূর্ণ করেন, কপালকুণ্ডলা কল্পনায় ধারণা হয় না। এইজন্য মতিবিবিকে প্রকাণ্ড দেখায়, কপালকুণ্ডলাকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখায়। মতিবিবি পার্থিব সুন্দরী,—পৃথিবীকে গুণ-গৌরবে ও রূপ প্রভায় আলোকিত করিয়াছেন; কপালকুণ্ডলা সুরসুন্দরীরূপে মেঘাবলীর মধ্য হইতে যেন দেখা দিলেন, ক্ষণিক পৃথিবীকে মোহিত করিয়া আবার মেঘাবলী মধ্যে যেন অদৃশ্যা হইলেন। মতিবিবির পার্থিব রূপ-রাজ্য পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিয়াছে, কপালকুণ্ডলা ক্ষণিক উদিত হইয়া পৃথিবীতে তাহার রূপ গরিমার যেন ক্ষণপ্রভা রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমবাবু মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলার চরিত্রে যে চিত্র প্রক্ষেপ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় অনেকদূর আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। মতিবিবিকে গ্রন্থকার যে স্থলে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাহার জীবন-কাব্যের এক নূতন সর্গের প্রারম্ভ মাত্র। কল্পনা এই সর্গকে প্রবুদ্ধ করিতে চাহে। প্রবুদ্ধ করিতে গিয়া তাহাকে কত প্রকার নূতন ভাবে ও প্রেমময় সঙ্কল্পে পরিপূর্ণ করে! মতিবিবিকে আমরা বাঙ্গালিনী পদ্মাবতী রূপে পুনর্জ্জীবিতা দেখি। তথাপি তাহাকে লাভ করিতে ভয় হয়, কপালকুণ্ডলাকে লাভ করিতে ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু মনে হয় কপালকুণ্ডলা সংসারাশ্রমের সুযোগ্যা পাত্রী নহেন। মতিবিবি ও কপালকুণ্ডলা উভয়েই অদমনীয়া ও সাহসিনী। মতিবিবি স্বীয় তেজস্বিতায় সাহসিনী, কপালকুণ্ডলা অজ্ঞানতায় সাহসিনী। ইহারা কেহই যেন গৃহমধ্যে আবদ্ধা থাকিবার নহেন, যেন স্বাধীন দুর্দান্তভাবে বেড়াইতে চান। কিন্তু ইহাদিগের এই চরিত্র-সাদৃশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থার পরিণাম। দুই জনে বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া এক স্রোতে মিশিয়াছেন। মিশিয়াই, ইহাদিগের উভয়েরই এমন স্বাধীনভাব আছে, যে একত্রে কিছুকাল থাকিবার নহে। দুই স্রোত দুই দিকে প্রবাহিনী রূপে চলিয়া গেল।

কপালকুণ্ডলার উপন্যাস-চিত্রে এই দুই দুর্দমনীয়া রমণীর অপর পার্শ্বে কাপালিক গম্ভীর মূর্ত্তিতে বসিয়া

রোষভরে যেন কটাক্ষপাত করিতেছেন। তাহার নিকট যেন ইহাদিগের শাসনদণ্ড রহিয়াছে। তাহার নিকটস্থ হইতে ভয় হয়, তাহার মূর্ত্তি কি ভীষণ, তন্ত্র-প্রোক্ত ক্রিয়া কলাপ কি ভয়ঙ্কর; কিন্তু তাহার হৃদয়ের কঠোরতা ও মন্ত্রণা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর! সে মন্ত্রণার দারুণ নিষ্ঠুরতা হেতু, তাহা মতিবিবির মন্ত্রণার সহিত মিশিতে পারিল না। মতিবিবি তত নির্ম্মম হইতে পারিলেন না। এই কাপালিকের ভয়ঙ্কর চিত্র বঙ্কিমবাবু কেমন গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ করিয়াছেন! এই কাপালিকের সম্মুখে সাগর, চারিদিকে বনস্থলী, নিকটে শ্মশান-ভূমি; সকলই ভয়ঙ্কর! তিনি সেই বনমধ্যে যেন দুর্জ্জয় শার্দ্দূলের ন্যায় বসিয়া থাকেন। মনুষ্য দেখিলেই তাহাকে বলিদান দেন। তাহার গম্ভীর বাক্য-ধ্বনি সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় বনমধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি যখন নবকুমারকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতেছেন, এবং কপালকুণ্ডলা নবকুমারের কর্ণে যখন বলিয়া গেলেন, "এখনও পলাও", এবং সেই কথা কাপালিক আকর্ণন করিয়া গম্ভীর ভাবে যেমন কহিলেন "কপালকুণ্ডলে!" তখন তাহার সেই স্বর মেঘগর্জ্জনবৎ নবকুমারের কর্ণে এবং বনমধ্যে ধ্বনিত হইল। আবার দেখুন কি ভয়ঙ্কর চিত্র! "নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

কাপালিক কহিল 'পূজার স্থানে।'

নবকুমার কহিলেন 'কেন?'

কাপালিক কহিল 'যথার্থ'।

অতি তীব্র বেগে নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন। যে বলে তিনি হস্ত আকর্ষিত করিয়াছিলেন,তাহাতে সচরাচর লোকে হস্ত রক্ষা করা দূরে থাকুক্—বেগে ভূপতিত হইত। কিন্তু কপালিকের অঙ্গমাত্রও হেলিল না—নবকুমারের প্রকোষ্ঠ তাহার হস্তমধ্যেই রহিল। নবকুমারের অস্থিগ্রন্থি সকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। মুমূর্ষুর ন্যায় কাপালিকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।"

আবার বলি কি ভয়ঙ্কর চিত্র! যম যেন নিজে নবকুমারকে মৃত্যুপার্শ্বে লইয়া যাইতেছেন।

বঙ্কিমবাবু উপন্যাসকারের যথারীতি অনুসারে এই কাপালিকের ইষ্টসিদ্ধি হইতে দেন নাই। কপালকুণ্ডলার দয়ার ব্যবহারে নবকুমার মুক্ত হওয়াতে কাপালিকের কার্য্যকে অধিকতর ঘৃণার্হ বোধ হইতে লাগিল। তাহার ইষ্টসিদ্ধি ভঙ্গে পাঠক সন্তোষ লাভ করিলেন। কাপালিক তখন রোষপ্রজ্জ্বলিত হইলেন। রোষ-প্রজ্জ্বলিত হইয়া একবার সাগরকূলে বৃহৎ বালিয়াড়ি স্তূপের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া ভীম কালাপাহাড়ের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, কোথা দিয়া শিকার ও কপালকুণ্ডলা পলাইয়াছে। কল্পনা এ চিত্রকে অনুমান করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়!

বঙ্কিমবাবু যখনই এই কাপালিককে দেখাইয়াছেন, তখনই তাহাকে হয়তো এক ভয়ঙ্কর স্থানে, এবং এক ভয়ঙ্কর সময়ে উপস্থাপিত করিয়া আমাদিগের কল্পনাকে

সহসা একেবারে আশঙ্কিত করিয়াছেন। এই কাপালিক যখন বনস্থলী পরিত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত, তখন দেখুন বঙ্কিমবাবু সহসা তাহাকে কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পাঠকের সম্মুখে আনিলেন।

"কপালকুণ্ডলা দ্রুত পাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। দ্রুত পদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময়ে যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন ব্রাহ্মণবেশী তাহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। বনত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র বনপথে আসিয়া বাহির হইলেন। তথায় তাদৃশ অন্ধকার নহে; দৃষ্টিপথে মনুষ্য থাকিলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন তাহার চিত্তভ্রান্তি জন্মিয়াছে। অতএব দ্রুত পদে চলিলেন। কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্য-গতিশব্দ শুনিতে পাইলেন। আকাশ নীল কাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত চলিলেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহ প্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি ভীষণরবে প্রঘোষিত হইল। কপাল-কুণ্ডলা দৌড়াইলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল সেও যেন দৌড়াইল, এমত শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টি-পথবর্ত্তী

হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকা বৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ, এবং অশনিসম্পাত শব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মূষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গনভূমি পার হইয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গনের দিকে সম্মুখ করিলেন। বোধ হইল যেন প্রাঙ্গন-ভুমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতীর-প্রবাসী সেই কাপালিক!”

আর আমরা পাঠকের সম্মুখে এই বিভীষণ চিত্র ধরিতে চাহি না। তাহার নাম করিলেই আমাদিগের ত্রাস হয়; আমাদিগের কল্পনা ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। এই কাপালিককে অধিকতর ঘৃণার্হ করিবার জন্য কবি তাহাকে—নির্দোষিণী, সরলা, দয়াশীলা কপালকুণ্ডলার বধার্থ সপ্তগ্রামে আনিয়াছেন। কাপালিক যখন সেই নির্দোষিণী ললনারত্নের নিধন-সাধনার্থ ফিরিতে লাগিলেন, তখন কাহার না রক্ত শিরায় শিরায় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে? কে না কল্পনায় কাপালিকের উপর খড়্গাহস্ত হইয়াছেন?

কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি, বঙ্কিমবাবুর এই তিনটি বৃহৎ চরিত্র কার্য্যশীল। নবকুমার লক্ষ্য। এই

তিন জনের মধ্যে যিনি যখন কার্য্য করিতেছেন—একাকী কি সমবেত হইয়া—সে কেবল নবকুমারের হৃদয় ব্যথিত করিবার জন্য। নবকুমারের হৃদয় বৃহৎ ক্ষেত্রময়; সকল প্রহরণ, সকল আঘাত সেই ক্ষেত্রে আসিয়া লাগিতেছে। যে প্রহরণে তিনি যেরূপ ব্যথিত হইয়াছেন, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। নবকুমারের হৃদয় যদি উগ্রভাবাপন্ন হইত, তাহা হইলে উক্ত চরিত্র-ত্রয়ের কার্য্যসকলের সহিত সেই হৃদয় বিঘর্ষিত হইত। একবার উগ্রভাব ধারণ করিয়া চরণতলস্থ লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিল। লুৎফ-উন্নিসা যবনী না হইলে বোধ হয় এস্থলেও নবকুমার উগ্রভাব ধারণ করিতেন কি না, সন্দেহ। কিন্তু সে আঘাত লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়স্রোতকে ফিরাইতে পারিল না। তাহাতে সেই স্রোত দ্বিগুণ বেগে বহিল। নহিলে নবকুমারের হৃদয় অতি কোমল ও দুর্ব্বল। তিনি প্রতি বায়ু-ফুৎকারে বিচলিত হন। তাহার হৃদয় মৃৎপিণ্ডবৎ। সে হৃদয়ে সকল প্রহরণের অঙ্কপাত হয়। তিনি অবস্থার দাস; ঘটনাস্রোতের তৃণ। ঘটনার প্রতিরোধে দাঁড়ান, তাহার সাধ্য নহে। তিনি ঘটনায় নীয়মান না হইলে কপালকুণ্ডলার উপন্যাস-জাল বিন্যস্ত ও বিজড়িত হইত না।

কপালকুণ্ডলার পুরুষ পাত্রগণ যে অতি সামান্য, তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক করে না। তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা

ও মতিবিবিই প্রধানা। বঙ্কিমবাবুর প্রায় সকল উপন্যাসই স্ত্রী-প্রধান। তিনি স্ত্রী-জাতির প্রকৃতি ও চরিত্র, অন্ত ও বাহ্য সৌন্দর্য্য, এবং মাধুর্য্য ও কমনীয়তা যেমন চিত্রিত করিতে পারেন যদি অপর জাতির পৌরুষ ভাব তৎসঙ্গে সঙ্গে তদ্রূপ অঙ্কিত করিয়া স্বদেশীয়গণের সম্মুখে তাহার চিত্র ধরিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উপন্যাসাবলি দ্বারা দেশের আর একটী উপকার সাধিত হইত। লোকে পুরুষত্বের গৌরব জানিতে পারিত। এক একটী উপ-ন্যাসের চিত্র তাহাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত। তাহারা সেই উপন্যাসের পাত্রগণকে অনেক সময়ে হয়ত অনুকরণ করিতে যাইত। বাঙ্গালীর জড় জীবনে তাহা হইলে কথঞ্চিৎ ঔপন্যাসিক পুরুষকার প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিত। বঙ্কিমবাবু তাহা হইলে শুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি নয়, দেশীয় লোকের চরিত্রেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিতেন।

বঙ্কিমবাবু রমণী-হৃদয়ের সুকুমার ভাব সকল অতি নিপুণতার সহিত বর্ণন করিতে পারেন। রমণী-হৃদয় সুকুমার ভাবে বিগলিত হইলে সেইভাব কাব্যে কিরূপ ঈষৎ প্রকাশিত, ঈষৎ অন্তর্নিহিত হইয়া থাকে, তাহা তিনি চিত্রকরের ন্যায় প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি রমণী-হৃদয়কে বিবিধ কাল্পনিক অবস্থায় পরিস্থাপিত করিয়া তাহার সুকুমারতার অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব সকল বিকশিত করেন। তাঁহার ঔপন্যাসিক রমণীগণ এই

জন্য হৃদয়ভাবে সুন্দরী। তাঁহার বিমলা ও মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা ও কুন্দনন্দিনী, আয়েসা ও সূর্য্যমুখী সকলেই এক এক ধরণের সুন্দরী। তাহাদিগের শারীরিক লাবণ্য অপেক্ষা হৃদয়ের লাবণ্য অধিকতর রমণীয়। তাহাদিগের হৃদয়-সৌন্দর্য্য এক এক বিশেষ ভাবে বিকসিত হইয়াছে। সেই এক এক বিশেষ ভাবে বিকসিত হইয়া প্রত্যেকের প্রকৃতিকে নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। ইহা-দিগের ভাবের উচ্চতায় উপন্যাসকে উচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস মধ্যে এই জন্য আমরা কেবল ভাবের রাজ্য দেখিতে পাই। কোথাও ভাবের প্রাচুর্য্য অতি গুরু ও প্রবল তরঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা ভাবের দ্বন্দ্ব অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গে ফল্গুনদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। কোথাও ভাব সকল এত উচ্চতায় উঠিতেছে, যে তাহাদিগের সম্পাত অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উপন্যাসকে গম্ভীর করিয়া তুলিতেছে। হৃদয়ের কোমলতাকে গৌরবে পূর্ণ করিতেছে। হৃদয়ের সুষমা গাম্ভীর্য্যে উত্তোলিত হইতেছে। হৃদয়ধারিণীকে সুন্দরী করিয়া তুলিতেছে। তাহার প্রকৃতি দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হই। দোষীকে নির্দ্দোষী ভাবি। সে ভাবাধিক্যে যে দোষ থাকে, ও তাহা কতদূর বিবেচনা-সঙ্গত, তাহা বিচার করিতে ভুলিয়া যাই।

বঙ্কিম বাবু গ্রীক সাহিত্যের বিয়োগান্ত নাটকের রীতি অবলম্বন করিয়া কপালকুণ্ডলার ঘটনাবলীকে

অদৃষ্টের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি এতদূর গিয়াছেন, যে গ্রন্থের একটী সমুদায় অধ্যায় অদৃষ্টবাদের প্রসঙ্গে পূর্ণ করিয়াছেন। উপন্যাসকে এই প্রকার মতামতের প্রবাহক করা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত তাহা অনেক কাল পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় বুধগণ এক প্রকার স্থির করিয়া গিয়াছেন। স্থির করিয়া গ্রীক নাটকের দূষণীয় রীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে রীতিকে পুনরুদ্ধার করা বিবেচনা-সিদ্ধ বোধ হয় না। তাহা করিলে উপন্যাসে একটী দোষ এই ঘটে, যে তাহাতে এই মতামত সকল মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। উপন্যাস এই মতামতের দৃষ্টান্ত-সাধক হইয়া উঠে। ঘটনাসকল দৈবের অনুসারী করিলে বিয়োগান্ত নাটকের গাম্ভীর্য্য অধিকতর প্রবর্দ্ধিত হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তাহাতে যে কুফল উৎপন্ন হয় তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। পৃথিবীতে ঘটনা সকল কখন কখন দৈববাণীর অনুসারী হইয়া পড়ে সত্য, কিন্তু সেই সমস্ত ঘটনা যে ঠিক দৈবের অনুসারী হইয়া ঘটিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? সে প্রকার বিশ্বাস করা কেবল নিতান্ত বিশ্বাস-প্রবণ হৃদয়ের ধর্ম্ম। এবং তাহাই লক্ষ্য করিয়া উপন্যাস মধ্যে তাহা দেখাইয়া দেওয়া কতদূর বিচার-সঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারি না।

এই প্রস্তাব অনেক দূর প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাকে আর বর্দ্ধিত করা বিধেয় নহে। বিষয়ের দোষ গুণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করিয়া সমালোচনা করা

আমাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। গ্রন্থের নিগূঢ় ও সুন্দর ভাব সকল প্রস্ফুটন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। যাহারা বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসাবলির সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছুক নহেন, তাহারা বোধ হয় সুন্দর চিত্র দেখিতে ইচ্ছুক নহেন, নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত হীরকমণ্ডিত আকাশ দেখিতে ইচ্ছুক নহেন, এবং বিচিত্র পুষ্প সুশোভিত উদ্যানের সুন্দর শোভা দেখিতেও ইচ্ছুক নহেন। তাহাদিগকে আমরা কি বলিব? তাহারা দূষিত দৃষ্টিশক্তি লইয়া বনবাসী হউন। সংসারের অপূর্ব্ব শোভা তাহাদিগের মনোমুগ্ধকর হইবে না।

শৈবলিনী।

চন্দ্রশেখর গ্রন্থাকাশের উজ্জ্বল তারা শৈবলিনী। এ তারাও গোপনে গোপনে এক চন্দ্রের (প্রতাপ) প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই এই চন্দ্রের প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ আকৃষ্ট হইয়া দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছিল। তাহারা একত্রে ক্রীড়া করিতেন, মালা গাঁথিতেন, জলকেলি করিতেন, সর্ব্বদাই একত্রে থাকিতেন। তারার অন্ধ অনুরাগ ক্রমশঃই প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। চন্দ্র সকলই বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু জানিয়াছিলেন এ তারার সহিত তাহার পরিণয় হইবার

যো নাই। যে সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর মিলিত, সেই সম্বন্ধই তাহাদিগের অন্তরায়। চন্দ্র এই জন্য সরিয়া গেলেন। কিন্তু তারার মন কাঁদিতে লাগিল। প্রতি সন্ধ্যাকালে তারা গগণ-দেশে নিয়মিত উদিত হইয়া চন্দ্রের জন্য সমস্ত গগণক্ষেত্রে সহস্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া বসিয়া থাকিতেন। চন্দ্র যখন রোহিণীর (রূপসীর) পার্শ্বে হাসিতে হাসিতে উদিত হইতেন, তারার সহস্র চক্ষু একে একে নিমীলিত হইত। তবুও তারা দূরদেশ হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া উজ্জ্বল ও স্থির নয়নে চন্দ্রের প্রতি তাকাইয়া থাকিতেন। একদিন চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হইলেন, কয়েক দিন গগণক্ষেত্র মেঘময় হইয়া রহিল, তারার সহিত চন্দ্রের সাক্ষাৎ নাই। তারা ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। তারা গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্ধ্যাবধি চন্দ্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শেষ প্রহরে একদিন চন্দ্রের সহিত তারার সহসা সাক্ষাৎ হইল। তারা পূর্ব্ব-দিকে সরিয়া গিয়া চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন রূপসী মেঘের আড়ালে ছিল। চন্দ্রের কোল দিয়া তারা হঠাৎ রূপসীকে দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, চন্দ্র রূপসীকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। তখন তাহারা পৃথক হইলেন, চন্দ্র রূপসীকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তারা অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পূর্ব্বাভিমুখে একাকিনী আরএক দেবতার (সূর্য্য-চন্দ্রশেখর) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

চন্দ্রশেখর গ্রন্থে দুইটী পৃথক্ উপন্যাস একত্র গ্রথিত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছুই নাই। যে সূক্ষ্মসূত্রে ইহারা পরস্পর আবদ্ধ, তাহাতে এত গুরুভার সহিতে পারে না। বিশেষতঃ শৈবলিনীর সহিত দলনীর কোন সম্পর্ক নাই; তাহারা কখন কোন সূত্রে সম্বদ্ধ ও মিলিত হয় নাই। অথচ শৈবলিনীর অন্যদিকে এরূপ একটী সুস্নিগ্ধ তারা উদিত না হইলে,গ্রন্থের শোভা সম্পাদিত হয় না। শুধু শোভা নয়, পাঠক শৈবলিনীর সহিত কাহারও তুলনা করিতে পারেন না। একদিকে শৈবলিনীর গৌরব, অন্যদিকে দলনীর মহত্ত্ব। দলনীর মৃত্যুকালে একদা তাহার মহত্ত্বে শৈবলিনীর গৌরব পরাজিত হইয়াছিল। শৈবলিনীর প্রণয়স্রোত প্রাবৃট্-কালীয় প্রবাহিনীর ন্যায় প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, সম্মুখে কোন বাধা মানিতেছে না, এবং স্রোতোবেগে প্রবাহ-পথ সরল হইয়া যাইতেছে। শত বাধা আসিয়া দলনীর প্রেমস্রোত ফিরাইয়া দিতেছে; তথাচ দলনীর প্রেম সেই সমুদ্রমুখেই যাইতে চাহে; অথচ কোন স্রোতস্বতীর সহিত তাহা মিলিতে চাহে না। সেই সমুদ্রের সহিত মিলিতে পারিল না বলিয়া আপনি বালুকাভূমিতে বিশুষ্ক হইয়া গেল, তথাপি এক পঙ্কিল প্রবাহিনীর সহিত মিশিল না। প্রেমের প্রাবল্য শৈব-লিনীকে যথেচ্ছ লইয়া যাইতেছে, এবং ঘটনাজালকে আপন অনুকূল পথে ফিরাইয়া আনিতেছে। ঘটনা

দলনীকে প্রেমপথ হইতে লইয়া যাইতেছে। একজন কুটীর-বাসিনী বনস্থশোভিনী, অন্যজন প্রাসাদ-সুন্দরী রাজোদ্যান-প্রমোদিনী। একজনকে যে দেখে সেই বিমুগ্ধ হয়, অন্যজন এমত এক নবাবের মন মোহিত করিয়াছিল যাহার মন শত শত সুন্দরীতেও মুগ্ধ হয় নাই। একজন কলঙ্কিনী হইয়াও নিরপরাধিনী, অন্যজন কলঙ্কিনী না হইয়াও অপরাধিনী। একজন দুরবস্থা হইতে প্রেম-গৌরবে উচ্চে উঠিতেছেন, অন্যজন ঐশ্বর্য্যের উচ্চ শিখর হইতে দুরবস্থায় নিপতিত হইয়া প্রকৃত প্রেম-মহত্বেই সকলকে বিমোহিত করিতেছেন। যিনি বলেন, কুটীরের দুঃখ-বিপণিতে প্রকৃত প্রেমও স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রীত হয়, তিনি শৈবলিনীকে দেখুন; যিনি বলেন, ঐশ্বর্য্যের বিলাস-ধামে প্রকৃত পবিত্র প্রেম অতি দুর্লভ, তিনি দলনী বেগমের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। একজন পূর্ব্বানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যজন বিরহে কাতরা হইয়া প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়াছেন। একজনের ভাগ্যে প্রেমবৃক্ষের ফল অতি তিক্ত বোধ হইল, অন্যজনের ভাগ্যে সেই ফল বিষাক্ত হইয়া প্রাণনাশক হইল।

অনেক বঙ্গ-রমণী শৈবলিনীর ন্যায় অনেক চন্দ্র-শেখরকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছেন। কি করিবেন, ইহা তাহাদিগের জাতীয় বিবাহপ্রণালী। তাহাদিগের এমত সাধ্য নাই, এমত বিবেচনা ও সাহস নাই, যে সেই প্রণালী ভঙ্গ করিয়া অন্যবিধ পরিণয়-সংস্কারে আবদ্ধ

হয়েন। যখন তাহাদিগের বিবাহ হয়, তখন তাহারা পিতা মাতার সম্পূর্ণ বশবর্ত্তিনী। তাহাদিগের যে বয়সে বিবাহ হয়, সে বয়সে স্বাধীন কার্য্য-শক্তি জন্মে না। সে বয়সের বিবাহ যে কি জন্য ধর্ম্মানুমত হইয়াছে ইহা আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইনা। যাহা হউক, এ প্রণালী যে সম্পূর্ণ দুষণীয় তাহা আমরা বলি না। ইহার বিস্তর দোষ, এবং সেই দোষ হেতু অনেক দম্পতী পৃথিবীতে চিরকাল অসুখী হইয়াছে। ইহার গুণে কোন কোন বঙ্গবামা সুখিনী হইয়াছেন। শুদ্ধ প্রণয়ের উপর বিবাহ নির্ভর করিলেও অনেক দোষ ঘটে। যৌবনের অন্ধ প্রেম অনেক সময় প্রতারিত হয়। ইয়োরোপীয় সভ্য সমাজে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক প্রণালীতে বলে—বিবাহ কর, প্রণয় তৎপরে আপনা আপনি সমাগত হইবে। অন্য প্রণালী বলে—প্রণয় হইতেই বিবাহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই মতদ্বয়ের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। যেখানে অগ্রে প্রণয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সেখানে সে প্রণয়কে দমন করিয়া বিবাহ দিলে বিবাহ কেবল অসুখেরই কারণ হইয়া থাকে। জুলিয়েট সুন্দরী প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন তবুও এমত বিবাহে সম্মত হইলেন না। তখন তাহার বয়স অতি অল্পই ছিল। কিন্তু বয়সে কি করে, তিনি সেই তরুণ বয়সেই সাহসে ভর দিয়া গোপনে গোপনে রোমিওকে বিবাহ

করিলেন। প্রণয়ের প্রতিকূলে বিবাহ দিতে গেলে কতদূর বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, সেক্‌সপিয়ার এই জুলিয়েটের দৃষ্টান্তে তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। শৈবলিনীও দেখাইয়াছেন, প্রণয়ের প্রতিকূলে বিবাহ হইলে বঙ্গ-বামাও এক দিন সেই প্রণয়ে উত্তেজিত হইয়া কতদূর দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। সেই প্রণয়ে তাড়িত হইয়া শৈবলিনী সংসার-ত্যাগিনী হইয়াছেন, মৃত্যুকে শতবার আহ্বান করিয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকার বিপদে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন। এই প্রেম-আবেগে তিনি এতদূর অন্ধ হইয়াছিলেন, যে তজ্জন্য একজন ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেও শঙ্কিত হয়েন নাই।

শৈবলিনী প্রণয়-আবেগের উত্তেজনায় যেরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভবনীয় করিবার জন্য, বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছেন যে, শৈবলিনী ও প্রতাপের প্রণয় অতি শৈশব হইতে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহা রোমিও এবং জুলিয়েটের প্রণয়ের মত সদ্যোজাত নহে। তাহা পরস্পরের সৌন্দর্য্যদর্শনেও উৎপন্ন হয় নাই। এ প্রণয়ের মূল বাল্য-সখ্যভাব। বয়সক্রমে এই সখ্য-ভাব দাম্পত্য-প্রণয়ে পরিণত হইয়াছিল। শৈবলিনীর হৃদয় প্রতাপের হৃদয়ের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই মিলন ও প্রণয় দিন দিন পরস্পরের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল। প্রণয়ের প্রকৃতি এই যে, ইহার প্রথম প্রাবল্যের সময় বাধা পাইলেই সাজ্যাতিক হইয়া পড়ে। প্রতাপ

এবং শৈবলিনী যখন জলমগ্ন হইয়া মরিতে যান, তখন আমরা এই প্রণয়ের প্রথম প্রাবল্য দেখিয়াছিলাম। তখন তাহাদিগের হৃদয়ে প্রণয়াবেগ অত্যন্ত প্রবল। সেই প্রণয় তখন তরুণ-কালের রিপুর ন্যায় কার্য্য করিতেছিল। ক্রমে এই প্রেমের প্রগাঢ়তা জন্মিল। প্রেমের প্রগাঢ়তার সহিত স্নেহ আসিয়া যোগ দিল। প্রেম পুরাতন হইলেই স্নেহ আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেয়। মায়া প্রণয়কে শতবন্ধনে বদ্ধ করে। মায়ার সহিত সহানুভূতি এবং আসঙ্গলিপ্সা অজ্ঞাতসারে উদয় হয়। প্রণয়, মায়া, সহানুভূতি এবং আসঙ্গলিপ্সা, সকলই শৈবলিনীকে প্রতাপের সহিত সুদৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। শৈবলিনী একদণ্ড প্রতাপকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না; প্রতাপকে দেখিলেও শৈবলিনীর সুখোদয় হইত। ইহারা যখন এইরূপ প্রেমে পরস্পর আবদ্ধ, তখন চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইল। এ বিবাহ শরীরের বিবাহ মাত্র, হৃদয়ের মিলন নহে। তরুণ কালের তরুণ প্রণয়ের সময় যখন প্রতাপ এবং শৈবলিনী জানিয়াছিলেন, তাহাদিগের বিবাহ হইবার যো নাই, তখন সেই নৈরাশ্যে তাহারা জলমগ্ন হইতে গিয়াছিলেন। তরুণ প্রণয়ের সম্মুখে বাধা পড়িলে প্রণয় কিরূপ কার্য্য করে, তাহা এই স্থলে প্রতীত হইয়াছিল। সেই প্রণয়ের গাম্ভীর্য্য জন্মিলে—সেই প্রণয়ের সহিত স্নেহ, সহানুভূতি এবং আসঙ্গলিপ্সার প্রাবল্য জন্মিলে

তাহা বাধা পাইয়া কিরূপ কার্য্য করে, চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ হইলে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। চন্দ্রশেখরের নিকট শৈবলিনী দায়ে কুমুড়া কাটিতেন। একি তাহার দোষ, তাহার হৃদয়ের দোষ, মানব প্রকৃতির দোষ? না তাহাদিগের সেরূপ বিবাহের দোষ? চন্দ্রশেখর ভালবাসায়, শৈবলিনীর শৈথিল্য আপনার দোষে আরোপ করিতেন। প্রতাপ যদি নিকটে না থাকিতেন, শৈবলিনী বোধ হয় তাহা হইলে বহুদিন পরে চন্দ্রশেখরের সহিত মিলিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। প্রতাপ নিকটে থাকিয়া শৈবলিনীর প্রণয়-আবেগ উদ্দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। প্রতাপ দেখিলেন, শৈবলিনীর নিকটে তাহার অন্তর্দাহ দ্বিগুণিত হইতেছে। যে শৈবলিনী চিরকাল নয়নের আনন্দদায়িনী ছিলেন, এখন চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বিবাহ হওয়াতে, তিনি অক্ষিশূল হইয়া পড়িলেন। এখন তাহার নিকট হইতে দূরে যাওয়াই ভাল। প্রতাপ এই স্থির করিয়া দূরে গেলেন। শৈবলিনী নয়ন-তারা হারা হইলেন। বিচ্ছেদের প্রথম আবেগ অত্যন্ত ভয়ানক। শৈবলিনী অনুক্ষণ পন্থা দেখিতে লাগিলেন কিরূপে প্রতাপকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন। এমত সময় ফষ্টর আসিয়া জুটিল। শুনিলেন ফষ্টরের কুঠি হইতে প্রতাপকে দেখা যায়। স্ত্রীসুলভ অজ্ঞানতাবশতঃ তিনি ফষ্টরকে ধরা দিলেন।

শৈবলিনী যখন চন্দ্রশেখরের বাটীতে ছিলেন, তখন

বোধ হয় অনেক দিন সুন্দরীর সহিত একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন। আমরা ইহার দৃশ্যমাত্রও চন্দ্রশেখর মধ্যে দেখিতে পাই না। সুন্দরীর নিকট শৈবলিনী কেমন অকস্মাৎ অজ্ঞাতভাবে আধ আধ হৃদয় খোলেন, এবং তৎক্ষণাৎ চতুরতার সহিত তাহা কেমন আধ আধ ঢাকিয়া লয়েন, এই সুন্দর দৃশ্যটি বঙ্কিমবাবু গোপন রাখিয়াছেন। গোপন রাখিয়াছেন এইজন্য, পাছে পাঠক প্রতাপের প্রতি আজি পর্য্যন্তও শৈবলিনীর প্রগাঢ় অনুরাগের আভাস পান। আভাস পাইয়া বুঝিতে পারেন, কেন শৈবলিনী ফষ্টরের সহিত গৃহত্যাগিনী হইলেন। বুঝিতে পারিয়া, সুন্দরীর সহিত যখন শৈবলিনী গৃহে ফিরিলেন না, তখন শৈবলিনীর উপর যেরূপ রাগান্ধ হইয়াছিলেন, পাছে সেই রাগ, সেই অসন্তোষের কিছু প্রশমতা হয়—এই জন্য গ্রন্থকার প্রথমে শৈবলিনীর হৃদয় পাঠকের নিকট প্রকাশিত করেন নাই। প্রকাশিত করেন নাই বলিয়া, পাঠক যেরূপ কৌতূহল-পরতন্ত্র এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শৈবলিনীর ভাগ্য দেখিতেছিলেন, সেরূপ ভাব কখনই উদ্রিক্ত হইত না। প্রকাশিত করেন নাই বলিয়া, শৈবলিনীর প্রতি যেরূপ ক্রোধের উদয় হইয়াছিল, সেই ক্রোধ হেতুই যখন উদ্ধৃতা শৈবলিনী প্রতাপের সমক্ষে হৃদয়-কবাট খুলিয়া দিলেন, তখন শৈবলিনীর হৃদয় অধিকতর সুন্দর বোধ হইল; যখন পাঠক

শৈবলিনীকে কলঙ্কে নিরপরাধিনী অনুতাপিনী রূপে দেখিলেন, তখন তাহার যতদূর সন্তোষ ও আনন্দ বোধ হইল, ততদূর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এইখানে শৈবলিনীর হৃদয়-সৌন্দর্য্য অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিলাম। ভাবিলাম এইরূপ হৃদয় লইয়া স্যাফো ফেয়নের জন্য সিসিলী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ভাবিলাম এই হৃদয়ে এঞ্জেলিনা, এড্‌উইনের জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন।

প্রণয় মানবকে সাহসী করে। প্রেম যখন রিপুতে পরিণত হয়, উৎসাহ ও সাহস তখন প্রেমের সহিত যোগ দেয়। অন্ধ প্রেম একাকী দুস্তর সাগর পার হয়, বিপদাকীর্ণ অরণ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করে, এবং শঙ্কাকুল অভিসার-পথে অনায়াসে গমন করে। সেই প্রেম শৈবলিনীকেও সাহসিনী করিয়াছিল। শৈবলিনী প্রেমের অনুরোধে ফষ্টরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, প্রেমের অনুরোধে ফষ্টরের সহিত গৃহ-ত্যাগিনীও হইয়াছিলেন; প্রেমের অনুরোধে একাকিনী প্রতাপের উদ্ধারের জন্য ইংরাজের নৌকাতেও প্রবেশ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন, ফষ্টর ইংরাজ হউক না কেন, প্রেম তাহার জাতীয় রূঢ়তা হরণ করিয়াছিল। তিনি দশ দিন দেখিয়াছিলেন, ফষ্টর তাহার নিকট বিনয়ী প্রেমভিখারী, নিরীহ ভালমানুষ মাত্র। ক্রমে পরিচয় এবং অভ্যাস শৈবলিনীকে ভয়-ভাঙ্গা করিয়াছিল। তিনি আর ফষ্টরকে ভয় করিতেন না। ভয় করিতেন না

এই জন্য, যে তিনি ফষ্টরের অগ্রে প্রতাপকে দেখিতেন। কল্পনাময় প্রতাপ তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। যখন ফষ্টরের সহিত বহির্গত হন, তখন তিনি ফষ্টরকে দেখেন নাই, সম্মুখে প্রতাপকে দেখিয়াছিলেন। শৈবলিনীর এখনকার হৃদয়ভাব পাঠকের অগোচর থাকাতে, ফষ্টরের সহিত শৈবলিনীর সম্মিলন ঘটনায় তিনি চকিত হইয়া যান। বাঙ্গালী-স্ত্রীলোকের সহিত ইংরাজের সম্মিলন ঘটনাকে তিনি নিতান্ত অসম্ভবনীয় জ্ঞান করেন। অন্য অবস্থায় বাস্তবিক ইহা নিতান্ত অসম্ভব হইত। কিন্তু শৈবলিনী এক্ষণে যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সে অবস্থায় ইহা অসম্ভবনীয় নহে। আমরা তাহার অবস্থা তাহার নিজকথায় ব্যক্ত করিব। প্রতাপ বলিলেন—"ইদানীং আমি তোমাকে সর্পিণী মনে করিয়া ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"বলিলেন, তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ দেবতা মূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে, ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না

কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না, যে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?—কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে?—তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া, কুপথ-সুপথ-জ্ঞানশূন্য হইয়াছি?—তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি?—তোমার জন্য। কাহার জন্য গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না?—তোমারই জন্য। নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

এই অন্ধকারময় জীবনে শৈবলিনী যে দিকেই একটু আলোক দেখিতে পাইলেন সেই দিকে ধাবিত হইলেন। প্রতাপের জন্য তাহার গৃহধাম যখন শ্মশান তুল্য হইয়াছিল, যখন তিনি সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ-সুপথ-জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, তখন তাহার নিকট ফষ্টরই বা কে, আর অন্য লোকই বা কে? উভয়ই সমান। যে উপায়ে হউক প্রতাপকে লাভ করাই তখন তাহার প্রবল ইচ্ছা। এই বলবতী ইচ্ছার অনুসারিণী হইয়া তিনি ফষ্টরকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী অন্য উপায়েও প্রতাপের নিকট আসিতে পারিতেন। কিন্তু শৈবলিনীর প্রকৃতি এরূপ ছিল না, যে তিনি কোন গোপনীয় ষড়যন্ত্রে এ কার্য্য সিদ্ধ করেন। সাহস কখন

লুকাইয়া কার্য্য করে না, কোন নীচবৃত্তি অবলম্বন করিতে অগ্রসর হয় না। সাহস যে শৈবলিনীর একটী প্রধান গুণ ছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সেই সাহস বরং তাহাকে প্রকাশ্য পাপ-পথে যাইতে দিবে, তথাচ গোপনীয় পথে যাইতে দিবে না। যৌবনের ধর্ম্ম এই যে, যৌবন গোপনীয় বিজ্ঞতার পথে বড় যাইতে চাহে না। সেই যৌবন ও প্রেম শৈবলিনীর সাহসকে দ্বিগুণিত করিয়াছিল। সেই সাহস ভরে, যে উপায় প্রথম তাহার নিকট উপস্থিত হইল, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি প্রতাপের নিকট যাইতে অগ্রসারিণী হইলেন। বঙ্কিমবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, এক এক জন বালকের প্রকৃতি এই-রূপ যে তাহারা জুজু বলিবামাত্র ভয় পায়, এক এক জন আবার সেই জুজু দেখিতে চাহে। আমরাও দেখিয়াছি এক এক জন নারীর প্রকৃতিই এইরূপ যে তাহারা গুপ্ত অপ্রকাশ্য পথে যাইতে চাহে না। শৈবলিনীর প্রকৃতি এইরূপ ছিল। এই জন্য তাহার প্রকৃতিতে ফষ্টরের সহিত বহির্গমন নিতান্ত অসম্ভবনীয় বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রতীত হয় নাই।

শৈবলিনী যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন, সেই প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রতাপ হর্ষোৎফুল্ল না হইয়া তাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া গালি দিল, তাহার প্রণয় এবং কার্য্যের জন্য তাহাকে ভৎর্সনা করিল। এই সমস্ত বাক্যে শৈবলিনীর হৃদয় শেলবিদ্ধ হইল।

তখন তিনি একান্ত ক্ষুব্ধা হইলেন। ভাবিলেনঃ—
"প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহ ত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম, কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?"

এইরূপ অনুতাপে শৈবলিনী এখন দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এখন বুঝিতে পারিলেন যে দুর্দমনীয় প্রেম তাহাকে এতদূর আনিয়াছে সে পাপ-প্রবৃত্তিকে তাহার দমন করাই উচিত ছিল। প্রতাপের জন্য যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এখন স্বাভাবিক তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল। শৈবলিনী তখন "কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল" সেই সঙ্গে সেখানকার সকল সুখ একবার স্মৃতিপটে উদয় হইল। প্রতাপকে মনে পড়িল, চন্দ্রশেখরের চিন্তায় এখন তাহার মনে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশিতে লাগিল। ভাবিলেন—"আমি তাহার যোগ্যা নহি বলিয়া আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে কি তাহার কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাহার কেহ নহি, পুথিই তাহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয় সেই কথাটী আমাকে কেহ আসিয়া বলে—

তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটা কথা তাহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?"

শৈবলিনী-হৃদয়ের এই চিত্রখানি কেমন স্বাভাবিক! কেমন সুন্দর! শৈবলিনী প্রতাপকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তাহার নিকট শান্তিলাভের জন্য উপস্থিত হইলেন; কিন্তু উপস্থিত না হইতে হইতেই সেই ভালবাসার জন্য ভর্ৎসিতা হইলেন; সুতরাং তাহার হৃদয়ে ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। যে তাহাকে ভালবাসিত, কিন্তু যাহার ভালবাসা তিনি তুচ্ছ করিয়া মনোদুঃখ দিয়া আসিয়াছেন, এখন হৃদয় স্বাভাবিক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি চন্দ্রশেখরের জন্য একবার কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু তৎপরেই ভাবিলেন যে, প্রতাপ আমাকে যাহাই বলুক, সেই প্রতাপ আমাকে ফষ্টরের হাত হইতে উন্মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন। প্রতাপ অবশ্যই আমাকে ভালবাসে। যে ভালবাসার জন্য প্রতাপ বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ভালবাসা তাহার হৃদয়ে এখনও সমপ্রভাবে অবশ্য উদ্দীপিত রহিয়াছে। সেই জন্য তিনি

ইংরাজের নৌকা হইতেও সাহস করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। উদ্ধার করিয়া আমার সম্মুখেই ইংরাজ-হস্তে বন্দী হইলেন। শৈবলিনী ভাবিলেন যিনি আমার জন্য এতদূর কষ্ট করিয়াছেন, এমন বিপদে পড়িলেন, তিনি আমাকে কি ভালবাসেন না? তাহার হৃদয় আবার প্রতাপের জন্য মায়ায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, এবং প্রতাপও গেল তিনি আর কিসের জন্য সংসারে থাকিবেন। সেই প্রতাপকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার মন উদ্বিগ্ন হইল। এমত সময় নবাবের লোক আসিয়া দলনীবেগম ভ্রমে তাহাকে নবাবের নিকট লইয়া গেল।

কবি, শৈবলিনীর চরিত্রে দেখাইয়াছেন যে, কামিনী-হৃদয়ে প্রেম-আবেগ কত প্রবলরূপে প্রভুত্ব করে। প্রণয় যে যে হৃদয়কে একত্র বন্ধন করে, সে হৃদয়মিথুন একত্র চিরদিনের জন্য উদ্বাহ-বন্ধনে মিলিত হওয়াই ভাল। নহিলে তাহাতে যে কতদূর কুফল ফলিতে পারে, শৈবলিনী তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শৈবলিনী দেখাইয়াছেন যে, যে রিপুকে সুশাসনে রাখিতে হইবে, তাহাকে সুশাসনে না রাখিতে পারিলে সাধ্বী কুলাঙ্গনারও কতদূর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অন্যদিকে প্রতাপ দেখাইয়াছেন, সেই রিপুকে কি প্রকারে দমন করিয়া রাখিতে হয়। শৈবলিনী স্ত্রীহৃদয়ের চরিত্র, প্রতাপ পুরুষের মনঃসংযমের চরিত্র। শৈবলিনীর হৃদয়ে প্রেমের

প্রবলতা ও অধীরতা, প্রতাপের হৃদয়ে প্রেমের শাসন ও ধৈর্য্য। শৈবলিনী ছুরিকা হাতে করিয়াও হৃদয় শাসন করিতে পারেন নাই, গঙ্গার তরঙ্গ সম্মুখিনী হইয়াও হৃদয় শাসন করিতে পারেন নাই, এবং বিপদের উপরে বিপদে পড়িয়াও হৃদয় শাসন করিতে পারেন নাই। তিনি প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যেখানে গিয়াছেন, সেই থানেই প্রেমতরঙ্গ আসিয়া তাহাকে বিষম তুফানে ফেলিয়াছে। প্রতাপ মনে করিলেই প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিতে পারিতেন, কিন্তু যতবার সেই প্রবৃত্তি-স্রোত তাহার নিকট প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ততবারই তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বেদগ্রামে দেখিলেন, শৈবলিনীর জন্য তাহার হৃদয় বিষম দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছে, তিনি সেই হৃদয়কে দমন করিবার জন্য বেদগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। শৈবলিনী প্রতাপের জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তাহার সমীপে উপস্থিত, প্রতাপ তখনও তাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শৈবলিনী তাহাকে ইংরাজহস্ত হইতে বিমুক্ত করিলেন, প্রতাপ তখন দ্বিগুণতর দৃঢ়তার সহিত হৃদয়কে সংযত করিয়া অনতিবিলম্বে শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনীর চরিত্রে প্রকৃতির ধর্ম্ম, প্রতাপের চরিত্রে লোকধর্ম্মের তেজস্বিতা। এক জন ইহলোকের সাক্ষ্য, অন্য জন পরলোকের গৌরব।

শৈবলিনীর যখন বিবাহ হইল, প্রতাপ ভাবিলেন,

এইবারে শৈবলিনী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু শৈবলিনী তথাপি প্রতাপকে পরিত্যাগ করিলেন না। শৈবলিনী যদি সদাকাল তাহার দৃষ্টিপথে না আসিতেন, যদি প্রতাপকে দেখিলে শৈবলিনীর নয়ন মন প্রফুল্ল না হইত, যদি প্রতাপের প্রতি তাহার মলিন মুখের কটাক্ষ নিশ্বাসভরে না পড়িত, যদি তিনি চন্দ্রশেখরকে লইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার-ধর্ম্ম করিতে পারিতেন, তাহা হইলে প্রতাপের বেদগ্রাম ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু প্রতাপ বেদগ্রামে দেখিলেন যে, শৈবলিনীর বিষদংশনে তিনি একদণ্ড বেদগ্রামে আর তিষ্ঠিতে পারেন না। সুতরাং তিনি বেদগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন এবং ভাবিলেন শৈবলিনীকে বিসর্জন দিলাম। চন্দ্রশেখর তাহার যে যে উপকার করিয়াছিলেন তাহারই প্রত্যুপকার সাধনার্থ প্রতাপ শৈবলিনীকে ইংরাজের নৌকা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিমুক্তা শৈবলিনী যখন তাহার নিকট হৃদয়-কবাট খুলিয়া দেখাইলেন, যে তাহাকেই লাভ করিবার জন্য তিনি আপনিই ফষ্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হইয়া আসিয়াছেন, তখন প্রতাপ আবার সেই বিষধরীর দংশনে জর্জ্জরিত হইলেন। ইংরাজেরা যখন প্রতাপকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, তখন কি প্রতাপ অহোরাত্র ভাবিতেন না কিরূপে শৈবলিনীর হাত হইতে তিনি বিমুক্ত হইবেন? এক এক দিন নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতেন আর এই চিন্তা তাহার মনে উদিত হইত। তিনি সেই

খানেই ভাবিয়াছিলেন, এবারে শৈবলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইব, যাহাতে তিনি আমাকে ভ্রাতৃরূপে অথবা পুত্রবৎ ভাবেন। তিনি এই চিন্তায় ব্যাকুল থাকেন এমত সময়ে সহসা একদিন সেই শৈবলিনী তাহাকে ইংরাজ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। প্রতাপ সাঁতারিয়া পলাইয়া গেলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন আর কেহ তাহার অনুসরণ করেন নাই। কিন্তু সম্মুখে দেখিলেন—শৈবলিনী। অমনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। তীরে উঠিয়াই ত আবার এই বিষধরীর হাতে পড়িতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এই চিন্তা তাহার মনে উদিত হইল। পলায়ন-উৎকণ্ঠার কথঞ্চিৎ তিরোভাব না হইতে হইতে এই ভাবনা তাহার মনে প্রবল হইল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি সেই উৎকণ্ঠার সময়েই সুযোগে গঙ্গার উপরে শৈবলিনীকে পূর্ব্ব-কল্পিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিবার জন্য প্রিয় সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ তাহাকে শৈ বলিয়া সম্বোধন করাতে, শৈবলিনীর হৃদয় গঙ্গার তরঙ্গ অপেক্ষাও ফুলিয়া উঠিল। যে চন্দ্র গঙ্গার বক্ষে ভাসিতেছিল তদপেক্ষা শোভনতর চন্দ্র শৈবলিনীর হৃদয়ে সহসা উদিত হইল। তৎক্ষণাৎ স্মৃতির জ্যোৎস্না তাহার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিল। কিন্তু কে জানে, ইহা শরতের জ্যোৎস্না মাত্র, ইহা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ শিখা। যে ঘোর নৈরাশ্য ও বিষাদের অন্ধকার ইহার পরেই

শৈবলিনীর হৃদয় আচ্ছন্ন করিবে, তাহার গাঢ়তা বাড়াইবার জন্যই কবি পূর্ব্বে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গঙ্গার শোভা বর্ণন করিয়াছেন।

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে; চন্দ্রমা গঙ্গার বক্ষে নৃত্য করিতেছেন। গঙ্গার প্রসন্ন হিল্লোল সেই চন্দ্রকরে নাচিতে নাচিতে মৃদুমন্দ গমন করিতেছে। সেই জ্যোৎস্নাময়ী গঙ্গার বক্ষে সুন্দরী শৈবলিনী সাঁতার দিয়া যাইতেছেন; প্রতাপের মুখচন্দ্র শৈবলিনীর দিকে ধাবিত হইতেছে। গঙ্গার আর এক চন্দ্র রোহিণীকে লইয়া যেন ক্রীড়া করিতেছেন। এই দৃশ্যটি কি সুন্দর, কি মনোহর! ইহা কবির সুন্দর কল্পনা। চিত্রকর এমন সুন্দর দৃশ্যে বর্ণ প্রয়োগ করিতে পারেন কি না সন্দেহ! বেল্‌মণ্টের পথে সুন্দরী জেসিকার সহিত লোরেঞ্জোর কথাগুলি আমাদিগের স্মরণ-পথে উদিত হয়, এবং আমরাও বলি এইরূপ চন্দ্রমাশালিনী রজনীতে শৈবলিনী প্রাণসম প্রতাপকে মুক্ত করিয়া গঙ্গার জলে সাঁতার দিয়া পলাইয়াছিলেন।

এই সুন্দর দৃশ্যে মোহিত এবং প্রতাপের মুক্তিতে আনন্দিত হইয়া আমরা শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের প্রিয় সম্ভাষণ শুনিতেছিলাম। "শৈ" বলিবা মাত্র আমাদিগের মনে এক কোমল ভাবের উদয় হইল। শৈবলিনীর শৈশব কাল মনে পড়িল, এবং তৎসঙ্গে সহস্র সুকুমার ভাব একে একে সঞ্চারিত হইল। ভাবিলাম, এত দিনে প্রতাপের মন বুঝি শৈবলিনীর দিকে বিনত

হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যাশায় শৈবলিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমরা প্রতাপকে প্রীত নয়নে দেখিতে ছিলাম। এমত সময়ে সহসা প্রতাপের কঠোর শপথ-বাক্য শৈবলিনীর নিকট ব্যক্ত হইল। অমনি সহসা পূর্ব্বকার সমুদায় ভাব তিরোহিত হইল। শৈবলিনীর সহিত আমাদিগেরও মনে সহসা কালমেঘে বজ্রনিনাদ ধ্বনিত হইল। আমরাও শৈবলিনীর সহিত কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইলাম। কি নিদারুণ বাক্য! শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তিনি ক্ষণেক পৃথিবীকে শূন্যময়ী দেখিলেন। ক্ষণেক তারা, চন্দ্র, সকলই নিবিয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল বোধ হইতে লাগিল। নীরবে নিশ্বাস বায়ু হৃদয়ভার বহন করিয়া গঙ্গার জলে পতিত হইতে লাগিল। তখন শৈবলিনী মৃদু মৃদু রবে বলিলেনঃ—

"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ? তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে,—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?—আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ—আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাহি না—তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব? আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

এত দিনের পরে শৈবলিনীর বিষম মনোভঙ্গ জন্মিল। এতক্ষণে 'তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত

তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল।’ তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না, প্রতাপ তাহাকে এতদূর নৈরাশ্যে ফেলিবে। যদি জানিতেন, তবে প্রতাপের জন্য তিনি এতদূর করিতেন না। এত দিনের পর তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন প্রতাপ তাহাকে কখনই গ্রহণ করিবেন না। প্রকৃতির প্রবলতা ধর্ম্মের কঠোরতার নিকট পরাজিত হইল।

শৈবলিনী যে আশাবৃক্ষের উচ্চশিরে উঠিয়াছিলেন, অকস্মাৎ এক প্রবল বাত্যায় তাহা হইতে বহুদূরে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণেক চেতনাবিরহিতের ন্যায় রহিলেন। প্রতাপের জন্য তিনি সর্ব্বসংসার পরিত্যাগ করিয়া এক বিষম সুবিস্তার সিকতাময় প্রান্তর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। এই প্রান্তরে যে মরীচিকার প্রতি তিনি এতকাল ধাবিত হইয়াছিলেন, নিকটে গিয়া দেখিলেন, সে মরীচিকার মনোহর দৃশ্য সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহার পূর্ব্বের পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় অতৃপ্ত রহিল; অথচ প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া দ্বিগুণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বদিকে শূন্য দেখিতে লাগিলেন। মরীচিকার সুন্দর হরিদ্দৃশ্য বিদূরিত হইল। চতুর্দ্দিক্ বালুকাময়। পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া ভাবিলেন—কেন তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! সংসারে যদি সুখ না থাকে, তবে সুখ আর কোথাও নাই! কিন্তু হায়, সে সংসারকে তিনি অন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছেন! তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন সংসার সুখের উল্লাসে হাসিতেছে। তাহার প্রতি বৃক্ষশাখে পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে প্রণয়-গীত গাহিতেছে। ধর্ম্মের স্বচ্ছ সরোবর প্রতি আশাবৃক্ষকে জীবন দান করিতেছে। আশা-বৃক্ষে শান্তির শত শত সুবর্ণ ফল সুরঞ্জিত হইয়া শাখীর শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সুখের সমীরণ সুমন্দ হিল্লোলে সরোবরে সুশীতল হইয়া শাখীগণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আন্দোলিত করিতেছে। সংসারীগণ ভাবনা চিন্তার আতপ তাপে তাপিত হইয়া যখন এই সুরমা কাননে প্রবেশ করে, বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মধুর প্রণয়-গীত শুনিলে তাহাদিগের শ্রবণ যুগল পরিতৃপ্ত হয়, সরোবরের সুশীতল বায়ু শরীর সুস্নিগ্ধ করে, এবং শান্তির সুস্বাদ ফল আস্বাদনে সন্তৃপ্ত হইয়া যায়।

এত দিনের পর শৈবলিনীর কল্পনা সংসারকে এইরূপ অনুরঞ্জিত করিয়া দেখাইল। সেই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, এই মরুভূমি হইতে কি ঐ সুখধামে আবার প্রবেশ করা যায় না? ভাবিয়া নিরাশ হইলেন। দেখিলেন সেই সুখধাম ত্যাগ করিয়া তিনি এই সিকতাময় প্রান্তরের অনেক দূর আসিয়াছেন। চন্দ্রশেখর তাহার স্বপ্নে উদিত হইলেন, কিন্তু সেই স্বপ্নেই আবার বিলীন হইলেন। তাহার সংসার-ধাম মনে মনে চিন্তা করিলেন, কিন্তু সে চিন্তা,

নিতান্ত ক্লেশকর হইল। সুন্দরীর কথা মনে হইতে লাগিল, কিন্তু সুন্দরীর কথা ভাবিতে গিয়া আপনাকে শতবার ধিক্কার দিলেন, লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন, এবং দারুণ অনুতাপ তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। কেন তিনি সুন্দরীর কথায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, এখন কি বলিয়া তাহাকে মুখ দেখাইবেন। সুন্দরীর শাপ-বাক্য এখন স্নেহ-বাক্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আহা, আর কি তিনি সে সুন্দরীকে পাইবেন; পাইলে কি সুখী হইবেন! ফষ্টরকে তিনি শতবার অভিসম্পাত করিলেন। নিজ বুদ্ধিকে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কিছুতেই সংসারে প্রবেশ করিতে তাহার সাহস হইল না। ঘোর নৈরাশ্য আসিয়া তাহার কল্পনাকে অন্ধকার করিল।

এত দিনের পর শৈবলিনী আপনাকে ঘোর পাপীয়সী বলিয়া স্থির করিলেন। এক্ষণে তাহার পূর্ব্বকৃত সমুদায় দুষ্কৃতি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখরকে পরিত্যাগ করিয়া আসা তাহার ভাল হয় নাই বুঝিতে পারিলেন। তিনি এত দিনে বুঝিতে পারিলেন "যৌবন-মদ" নারীর পক্ষে বিষম বিপদ; তখন 'প্রেমের পুলকে' গদ্‌গদ থাকিয়া নারী সকল প্রকার দুষ্কৃতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তিনি আরও ভাবিলেন, ফষ্টর যদি জীবিত থাকিত তাহার ভাগ্যে আরও কত অনিষ্টাপাত হইত। ফষ্টর হয় ত তাহার জীবন-স্রোতকে আর এক দিকে ফিরাইয়া দিতেন; তিনি হয় ত এক জন বারাঙ্গনার মধ্যে

পরিগণিত হইতেন। কি মহাপাপই করিয়া তিনি সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রেমের উন্মত্ততা রমণী-গণকে অন্ধ করিয়া কোথায় লইয়া যায় তাহার ঠিক নাই। রমণীর হৃদয়ই তাহার প্রধান শত্রু। শৈবলিনী আর সে হৃদয়কে বিশ্বাস করিবেন না। ভাবিলেন, হৃদয় যে দিকে ইচ্ছা যাউক, তিনি অদ্য হইতে চন্দ্রশেখরকে ধ্যান করিবেন; চন্দ্রশেখরের মূর্ত্তি অন্তরে স্থাপন করিবেন, চন্দ্রশেখরকে পূজা করিবেন; আর প্রতাপকে ভাবিবেন না। চন্দ্রশেখরকে পদে পদে অন্তর্বেদনা দিয়া তিনি যে দুষ্ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তজ্জন্য তাহার মনে মহা আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি গঙ্গার উপকূলে বসিয়া সুশীতল সমীরণেও এইরূপ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে ছিলেন। এক দিকে প্রতাপের ব্যবহার দেখিয়া ঘোর মনস্তাপ, অন্য দিকে চন্দ্রশেখরের জন্য বিষম মনস্তাপ। এই দ্বিবিধ তাপে তাপিতা হইয়া তিনি যথেচ্ছ চলিয়া গেলেন। "যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই,—আশা নাই,—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে

ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই নিজ স্বভাব গুণে তাহার সন্ধান করিবে। এজন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিল ততদূর চলিয়া গেল।'

যে আন্তরিক অন্ধকার এখন শৈবলিনীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, যে ঘোর আত্মগ্লানি ও চিন্তা তাহার হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, তাহার গাম্ভীর্য্য, প্রচণ্ডতা, ও ভীষণতা দেখাইবার জন্য কবি শৈবলিনীকে পর্ব্বতোপরি লইয়া গেলেন। তথায় পার্ব্বতীয় মেঘ, ঝড়, ও অন্ধকারে তাহাকে প্রক্ষিপ্ত করিলেন, এবং পরিশেষে শৈবলিনীর আন্তরিক চিত্র প্রকাশিত করিয়া দেখাইলেন, যে সেই চিত্র প্রকৃতির এই বাহ্য বিভীষণ মূর্ত্তি হইতেও গম্ভীর, প্রচণ্ড ও ভীষণতর। গ্রন্থের এই ভাগটী যেমন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, মহান্, ও ভয়ঙ্কর এমত আর কোন স্থল নহে। আমরা একদা বাহ্য ও আন্তরিক জগতের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হই। সম্মুখে দেখি প্রকাণ্ড পর্ব্বত; পার্ব্বতীয় দেশ মেঘ ও অন্ধকারে পরিপূর্ণ, এবং প্রবল ঝটিকায় লণ্ড ভণ্ড হইতেছে; পর্ব্বতের মধ্যে মহান্ধকারময় গুহা; এবং গুহার মধ্যে ভীষণতর মহাকায় পুরুষ। এইখানে শৈবলিনী একাকিনী প্রস্থিতা হইয়াছেন। শৈবলিনী একাকিনী এই পর্ব্বতের সানুদেশে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তাহার হৃদয় অন্ধকারময়, হৃদয়ে ভাবনার প্রবল বাত্যা বহিতেছে। এমত সময় দেখিতে দেখিতে

পৃথিবীও অন্ধকারময়ী হইল। নিবিড় কাদম্বিনীজাল গগনদেশ আচ্ছন্ন করিল, প্রবল বাত্যা উঠিল, মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই অন্ধকার ও ঝটিকার সময় শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশ কে যেন স্পর্শ করিল। শৈবলিনী শিহরিয়া না উঠিতে উঠিতে তাহাকে কে যেন ধরাধরি করিয়া অন্ধগুহা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিল। এ সমুদায় দৃশ্যই ভয়ঙ্কর। কিন্তু তদপেক্ষা ভীষণতর দৃশ্য পরে প্রকটিত হইবে। তাহা শৈবলিনীর প্রদীপ্ত শিরা, জ্বলন্ত কল্পনা, ভীষণ আত্মগ্লানি, ভয়ঙ্কর নরকের চিত্র, এবং হৃদয়ের দহন ও যন্ত্রণা। এক দিকে বাহ্য-প্রকৃতির শাসন, অন্য-দিকে ধর্ম্ম-প্রকৃতির মহাদণ্ড; ধর্ম্মের মহাদণ্ড বাহ্যজগতের শাসন অপেক্ষাও গুরুতর হইয়া উঠিল। দৃশ্য গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর এবং ভীষণ হইতেও ভীষণতর হইতে লাগিল। এরূপ ধর্ম্মীয় গাম্ভীর্য্যের গৌরব, যদি প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্যের পর চিত্রিত না হইত, তাহা হইলে সেই প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্য-চিত্রের শেষ রক্ষিত হইত না, এবং ধর্ম্মেরও গৌরব তাদৃশ উজ্জ্বল বর্ণে প্রকাশিত হইত না।

শৈবলিনী যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিলেন, কল্পনায় রাত্রিদিন নরক দেখিতে লাগিলেন। এই হৃদয়-দহন হইতে মুক্ত হইবার জন্য এবং চন্দ্রশেখরের সহিত পুনরায় মিলিত হইবার জন্য, তিনি এক ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হইলেন। এই প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধি কায়মনোবাক্যে সম্পন্ন করিলেন। আমরা এরূপ ঘোর

আত্মগ্লানি, ভীষণ অনুতাপ, হৃদয়-দহন এবং প্রায়শ্চিত্তের চিত্র আর কুত্রাপি অবলোকন করি নাই। কল্পনা এরূপ হৃদয়যন্ত্রণা ও প্রায়শ্চিত্তের ভাব অনুমান করিতেও শঙ্কিত হয়। চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর যদি বিবাহ না হইত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় এমন জ্বলন্ত অনুতাপের চিত্র কখনই দেখিতে পাইতাম না। কারণ, তাহা হইলে শৈবলিনী আপনাকে ততদূর পাতকিনী জ্ঞান করিতেন না। এমন জ্বলন্ত হৃদয়-দহনের একখানি পরিস্ফুট চিত্র দিবার জন্যই যেন কবি শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের বিবাহ দিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর দেখিলেন তাহার ইহলোকেই নরকভোগ হইতেছে। চন্দ্রশেখর তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। বলিতে গেলে, এই খানেই এই উপন্যাস ভাগ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের কি চমৎকার প্রণয়! শৈবলিনী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তবু চন্দ্রশেখর তাহার প্রণয়ে মগ্ন হইয়া চিরদিন সংসারে বিরাগী হইয়া রহিলেন। বিরাগী হইয়া অনুদিন শৈবলিনীর অনুসরণ করিলেন। এবং যখনি শৈবলিনী তাহার শরণাপন্ন হইল, অমনি তিনি সংসারের নীচনীতি তুচ্ছ করিয়া সেই প্রেমে অনুতাপিনী শৈবলিনীকে গ্রহণ করিলেন। দেখাইলেন, প্রকৃত প্রেম কখন নীচতার বশবর্ত্তী নহে। তাহার উচ্চতায় ও উদারতায় ধর্ম্মনীতি উঠিতে পারে না। এই প্রেম দেব-প্রতিম, ইহা মানবকে দেবতুল্য করিয়া তুলে। মানব

তখন সংসারের নীচ নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

কিন্তু চন্দ্রশেখরের এই উদারতার গৌরব বঙ্কিমবাবু তৎপরে কথঞ্চিৎ ম্লান করিয়াছেন। ইহার পর তিনি চন্দ্রশেখরকে এরূপ সাজাইয়াছেন, যেন চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সতীত্বরক্ষার অমোঘ নিদর্শন ও প্রমাণাদি না পাইলে তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন না। যেন তাহার হঠাৎ শৈবলিনীকে গ্রহণ করিতে মনঃপূতি হয় নাই। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর অগ্নি-পরীক্ষা চান। এই খানে চন্দ্রশেখর লোক ধর্ম্মে নামিয়াছেন। এই খানে বঙ্কিম বাবু সাধারণ পাঠকগণের সন্তুষ্টি-সাধন করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের দৃষ্টান্তে তিনি কি এক উচ্চতর ধর্ম্মের গৌরব দেখাইতে পারিতেন না? সে অবসর তাহার বিলক্ষণ ছিল। তথাপি তিনি নানাবিধ জল্পনায় চন্দ্রশেখরের গৌরব কথঞ্চিৎ ম্লান করিয়া অনর্থক গ্রন্থের সম্প্রসারণ করিয়াছেন। আর যদি সাধারণ পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করাই গ্রন্থকারের একান্ত অভিলাষ হইয়াছিল, তবে শৈবলিনীকে পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য চন্দ্রশেখর যাহা যাহা করিয়াছিলেন তাহা অল্পের মধ্যে বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত, নানাবিধ দৃশ্য রচনার আবশ্যকতা ছিল না।

শৈবলিনী প্রবল-প্রকৃতির* দৃষ্টান্ত। মানব প্রকৃতির প্রাবল্য কিরূপ বুঝাইতে হইলে আমরা শৈবলিনীর প্রতি

* Violent nature.

নির্দেশ করিব। প্রবলপ্রকৃতির যে দোষ, তাহা শৈবলিনীতে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু প্রবল প্রকৃতির যে দুর্নিবার বেগ, যে অদমনীয় তেজ, যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, ও অবশ্যতা তাহা শৈবলিনীর ছিল। এই প্রকৃতি পদ্মার স্রোতের ন্যায় তীরভূমি ভঙ্গ করিয়া, ঝটিকার ন্যায় বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ভয়ঙ্কর বেগে বহিয়া যায়। সম্মুখের কোন বাধাই মানে না। আমরা এই প্রকৃতির বেগ দেখিয়া স্তম্ভিত হই। শৈবলিনীর এই প্রকৃতি কিছু বিলম্বে জাগরিত হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর সেই প্রকৃতি যখন একবার সম্যক্ উদ্রিক্ত হইল, বাঙ্গালিনীতেও সেই প্রকৃতির তেজ কিরূপ দুর্দমনীয় হইতে পারে শৈবলিনী তাহা প্রদর্শন করিলেন। তেজস্বিনী শৈবলিনী ফষ্টরকেও ভয় করেন নাই, তাহার নিকট তেজস্বিতার সহিত নিজ সতীত্ব রক্ষা করিলেন, প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, নির্ভয়ে নবাবের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আশ্চর্য্য তেজে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন এবং অবশেষে প্রতাপ-উদ্ধারের জন্য বর্ম্মধারিণী হইয়া বহির্গত হইলেন। তেজ যতদূর যাইবার, অবাধে যাইতে লাগিল। শেষে যখন একদিকে সেই তেজ সম্যক্ ব্যয়িত হইল, প্রকৃতি তখন নিস্তেজ হইয়া একবার শান্তভাব ধারণ করিল। এ প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিলে সমুদ্রের ন্যায় শান্ত হয়। সমুদ্রে—চন্দ্র, তারকা, গগন, একবার প্রতিবিম্বিত হইল।

শৈবলিনী একবার সমুদায় ভাবিয়া দেখিলেন। কোথায় গিয়াছিলেন তাহা দেখিলেন; ততদূর তাহার যাওয়া উচিত ছিলনা ভাবিলেন। যথায় যাওয়া উচিত আবার ফিরিলেন। সেই দিকে আবার শৈবলিনীর তেজস্বিনী প্রকৃতি-বল নিয়োজিত হইল। প্রকৃতি আবার সমান বেগে বহিতে লাগিল। এরূপ প্রকৃতির ধর্ম্ম এই যে, যে বিষয়ে নিয়োজিত হয় তাহার একশেষ করিয়া ফেলে। শৈবলিনীর অনুতাপের প্রবলতা দেখে কে? ততদূর অনুতাপের তেজ সাধারণ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। শৈবলিনীর অনুতাপ যতদূর যাইবার গেল। যে কোন উপায়ে চন্দ্রশেখরকে পাইবেন এখন সেই উদ্দেশে ফিরিতে লাগিলেন। তজ্জন্য যথাকষ্টে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। প্রায়শ্চিত্তে শরীরপাত করিয়া উন্মত্ত হইয়া গেলেন। চন্দ্রশেখরকে লাভ করিয়া তবে আবার শৈবলিনী নিরস্ত হইলেন। যিনি শৈবলিনীকে এই ভাবে দেখিবেন তিনি শৈবলিনীর দোষ গুণ সকলই বুঝিতে পারিবেন। শৈবলিনীর যাহা দোষ তাহা আতিশয্যের দোষ, যাহা গুণ, তাহা নিষ্পাপ প্রকৃতির গুণ। তাহার দোষে অনেকেই চমকিত হইবেন, তাহার গুণ অল্প লোকেই বুঝিতে পারিবেন।

প্রতাপের ধীর তেজ শৈবলিনীর প্রবল তেজের পার্শ্বে চমৎকার শোভা পায়।

দলনী এবং শৈবলিনীর ভাগ্য ভাবিতে ভাবিতে আমাদিগের একটী সুন্দর ইসপ-লিখিত গল্প মনে পড়িল। সে

গল্পটী আমরা অন্যত্র দেখি নাই বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম। একদা মদনরাজ আতপতাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া একটী সচ্ছায় শীতল গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভ করিলে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তূণীর হইতে শরকলাপ বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি জানেন না, ঐ গুহা যমরাজের আশ্রয়-স্থান। সায়ক সকল বিক্ষিপ্ত হইলে যমসঙ্গিগণ মৃত্যু-সায়কের সহিত তাহাদিগকে মিশাইয়া দিল। অনতিকাল পরে মদনরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সম্মুখে দেখিলেন যমরাজ। অমনি শশব্যস্তে তূণীর মধ্যে নিকটস্থ কতিপয় সায়ক প্রক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। কতকগুলি মৃত্যু-শর তূণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল; এবং মদনেরও কতকগুলি সায়ক সেই যমগুহায় পড়িয়া রহিল। দলনী বেগমের সহিত যখন নবাবের মিলন হইয়াছিল, আমা-দিগের অনুমান হয়, তখন মদনরাজ ভ্রমক্রমে দলনীর প্রতি একটী মৃত্যু-সায়ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এবং শৈবলিনী যখন প্রতাপের সহিত জলে ডুবিয়া মরিতে যান, তখন বোধ হয় যমরাজ তাহার প্রতি একটী মদন-শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই জন্য মরিতে গিয়া, তিনি প্রেমসাগর হইতে ডুবিয়া উঠিলেন। মদন-শর মৃত্যুহস্ত-স্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাহার প্রণয় যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণার কারণ হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার মিলন হইয়া গেল। দলনীর ভাগ্য সেরূপ হইল

না। মৃত্যু-শর মদনহস্ত-স্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া দলনী কিছু দিন সুখসম্ভোগ করিলেন; কিন্তু অবশেষে প্রণয়ই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। দলনী সংসার অন্ধকার করিয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিলেন।

রজনী।

যাহা চন্দ্রশেখরে নাই, রজনীতে তাহা আছে। যে সাহস শৈবলিনীরও ছিল না, অন্ধ রজনীর তাহা ছিল। প্রতাপকে প্রাণসম ভালবাসিয়া শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিলেন কেন? রজনী অন্ধ হইয়াও সেরূপ পরিণয়হস্ত হইতে অনায়াসে মুক্ত হইলেন। অন্ধতা প্রযুক্ত রজনী শৈবলিনী অপেক্ষা দুর্ব্বলা, কিন্তু রজনীর হৃদয়বল তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতাকে পরাজয় করিয়াছিল। তিনি সেই বলে বলবতী হইয়া এক সামান্য সাধন অবলম্বন করিয়া অন্ধতা সত্ত্বেও শচীন্দ্রের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। দেখাইলেন, শারীরিক বল হৃদয়-বলের নিকট অতি সামান্য বিষয়। যে তেজ হৃদয়ে জাগে, শরীরে তাহা ধারণ করিতে পারে না। শৈবলিনীর সে তেজ ছিল না, আমি তাহা বলি না। কিন্তু শৈবলিনীর সে তেজ সময়ে জাগরিত হয় নাই। যখন শৈবলিনীর সে তেজ উঠিল, তখন দিবার মধ্যাহ্ন-

কাল অতীত হইয়াছে। সে তেজ অসময়ে উঠিয়া অতি দুর্দমনীয় হইয়া পড়িল। অপরাহ্নে মধ্যাহ্ন রবির রৌদ্র ফুটিল, যেন মধ্যাহ্ন রবির কিরণ রাহুতে গ্রাস করিয়াছিল। রজনীর তেজ সময়ে উদিত হইয়া তাহার জীবন-জগৎ আলোকিত করিয়াছিল। এই জন্য বলি চন্দ্রশেখরে যাহা নাই রজনীতে তাহা আছে।

আবার শৈবলিনী, তুমি লবঙ্গলতার কাছেও হারি মানিলে? তোমার চন্দ্রশেখর কিছু লবঙ্গলতার মিত্রজার মত বৃদ্ধ ছিলেন না। তবু লবঙ্গলতার অনুরক্তি তোমাতে কই? তোমার প্রতাপ তোমাকে ছাড়িয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, লবঙ্গলতার অমরনাথ চিরদিন লবঙ্গের জন্যই ছিল। তথাপি লবঙ্গ একদিনও তাঁহার প্রতি] চাহিয়াও দেখেন নাই। লবঙ্গের হৃদয়ে তাহার স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও জন্য অণুমাত্র স্থান ছিল না। লবঙ্গ যদি অমরনাথকে ভাল বাসিতেন, সে ভালবাসা ইহলোকের জন্য নহে। শৈবলিনী এই দেখ, লবঙ্গলতার সুন্দর হৃদয়ভাব দেখ:—

"অ।—কিন্তু তুমি কখন যদি ইহার পর শোন যে অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।

অ। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি।

তোমার এই সমুদ্র-তুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না--যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না?"

এই হৃদয়ভাব কেবল প্রতাপের চিত্তসংযমের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। প্রতাপও বলিয়াছিলেন এজন্মে শৈবলিনীর প্রতি অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া আমি দেহ পরিত্যাগ করিলাম। চন্দ্রশেখরের প্রতাপ, রজনীর লবঙ্গলতা। রমণী-হৃদয়েও যে প্রতাপের পৌরুষবল অবস্থান করিতে পারে, লবঙ্গলতা তাহাই প্রদর্শন করেন। শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের যে সম্বন্ধ, অমরনাথের সহিত লবঙ্গেরও সেই সম্বন্ধ। শৈবলিনী রমণীর ন্যায় অধীরা হইয়াছেন, অমরনাথ পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সেই শৈবলিনী অধীরা না হইয়া, প্রতাপের মত সুধীর হইলে তাহাকে কিরূপ সুন্দর দেখাইত, লবঙ্গলতায় সেই চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সুধীরতা শৈবলিনীতে নাই, লবঙ্গলতায় তাহা আছে। এই জন্য বলি, চন্দ্রশেখরে যাহা নাই, রজনীতে তাহা আছে।

আবার প্রতাপ, তোমার ইন্দ্রিয়সংযম প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু তুমি কি অমরনাথের নিকট দাঁড়াইতে

পার? শৈবলিনীর প্রতি তোমার অনুরাগ শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, অহর্নিশি বিচরণ করিয়াছে। সেই অনুরাগ অহোরাত্র পোষিত করিয়া তুমি কিরূপে রূপসীকে আবার ভালবাসিতে পারিতে? শৈবলিনীর প্রতি তোমার অনুরাগ দেখিয়া অনুমান হয়, তুমি রূপসীকে কখনই ভালবাস নাই। কেন তবে রূপসীকে গলগ্রহ করিয়াছিলে? অমরনাথের ন্যায় বিবাহে উদাসীন থাকিলে তোমার প্রণয় কি অধিকতর পবিত্র হইত না? অমরনাথ বহুকাল লবঙ্গের প্রণয় গোপনে পোষিত করিয়াছিলেন। শেষে অমরনাথ নিরাশ হইয়া সংসারে বিরাগী হইয়া গেলেন। সংসারে বিরাগী হইয়া গেলে ক্রমে তাহার সেই অনুরাগ অণু-মাত্রায় কমিতে লাগিল। অবশেষে তাহার হৃদয় শূন্য হইল। তিনি বাহ্যজগৎ হইতে হৃদয়কে প্রত্যাখ্যান করিয়া অন্তর্জগতে তাহা নিবৃত্ত করিলেন। অমরনাথ অন্তর্জগন্ময় হইলেন। বাহ্যজগৎ তাহার সম্মুখ হইতে তিরোহিত হইল। এখন আর সে প্রেমনৈরাশ্য নাই, এখন অন্যভাব উপস্থিত। প্রেমনৈরাশ্য বৈরাগ্য আনিয়া দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। মানব একভাবে চির-কাল তিষ্ঠিতে পারে না। বৈরাগ্য ত্বরায় হৃদয়শূন্যতা দেখাইয়া দিল। একদিন অমরনাথ যখন প্রেমনৈরাশ্যের সেতু পার হইয়া বৈরাগ্যে আসিতেছিলেন, তখন বাহ্য-জগৎ হইতে অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে করিতে বাহ্য

জগতের উপর জয়লাভ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সুখজ্ঞান করিয়াছিলেন। ক্রমে সে সুখবোধ তিরোহিত হইল। তখন আবার অন্তর্জগৎ শূন্য জ্ঞান হইল। সে ভাব আর তাহার সুখজনক বোধ হইল না। তিনি বৈরাগ্য-পরতন্ত্র হইয়া এতকাল সর্ব্বপ্রকার কাম্য পদার্থ হইতে হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। লবঙ্গকে একেবারে ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আবার অমরনাথের হৃদয় বাহ্য জগতে ফিরিল। যখন তাহার হৃদয় পৃথিবীর দিকে ফিরিল, আবার প্রেম-নৈরাশ্যের পথে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেখিলেন বাহ্যজগতে তাহার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। যাহা বাঞ্ছনীয় ছিল আজিও তাহা আছে;—কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া বহুকাল তাহা হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়াছেন। আর পুনর্জীবিত করা বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্য তিনি অন্য কোন বাঞ্ছনীয় পদার্থ সংসারে খুঁজিতে লাগিলেন। যে প্রেমপুত্তলীকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাহাকে আর হৃদয়ে স্থান দিলেন না। প্রতাপের ন্যায়, লবঙ্গের অনুরাগ তাহার শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আর প্রবিদ্ধ নাই। এখন তিনি সে অনুরাগ হইতে শুদ্ধসত্ব হইয়াছেন। যতদিন সে অনুরাগ ছিল, ততদিন অন্য কাহাকে হৃদয়ে স্থান দেন নাই। সে অনুরাগ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে তাহার হৃদয়-সিংহাসন অন্য প্রেম পুত্তলীর জন্য প্রসারিত করিলেন। ঘটনাক্রমে রজনী সেই সিংহাসন অধিকার

করিলেন। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এস্থলে বর্ণনীয় নহে। যাহা প্রদর্শিত হইল তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রণয়-পবিত্র অমরনাথের নিকট প্রতাপ কখনই দাঁড়াইতে পারেন না। প্রতাপের হৃদয়ের উপর বঙ্কিমবাবু আর একরেখা বর্ণ প্রয়োগ করিয়া অমরনাথকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অমরনাথকে সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন পাঠক, তুমি ত প্রতাপের চরিত্রে মোহিত হইয়াছ; কিন্তু আমি এই যে অমরনাথকে সৃষ্টি করিলাম তাহা একাংশে প্রতাপ হইতেও উচ্চতর; তুমি কি অমরনাথের উচ্চতা অনুভব করিতে পারিবে? এক প্রতাপই সামান্যচরিত্র-জনগণ অপেক্ষা কতদূর উচ্চ; অমরনাথ তদপেক্ষাও উচ্চতর। এই উচ্চতা অনুভব করিতে পারিলে তবে পাঠক বুঝিতে পারিবে, চন্দ্রশেখরে যাহা নাই, ক্ষুদ্র রজনীতে তাহা আছে।

কিন্তু অমরনাথ ও প্রতাপ ইহাঁরা দুইজনে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। অমরনাথ আশৈশব লবঙ্গকে ভালবাসিতেন, প্রতাপও শৈবলিনীকে আশৈশব ভাল বাসিতেন। যে কারণেই হউক, ইহাঁদিগের প্রণয়-মিলন সম্পন্ন হইল না। কিন্তু এই প্রেমনৈরাশ্য দুইজনকে দুই স্বতন্ত্র পথে লইয়া গেল। ইহা অমরনাথকে সন্ন্যাসী করিল, কিন্তু প্রতাপ তাহা হৃদয়ে অনায়াসে ধারণ করিয়া দ্বিতীয় নারীর পাণিগ্রহণানন্তর বিলক্ষণ সংসারী হইলেন। যাহা প্রতাপ অনায়াসে বহন করিলেন, অমরনাথ

তাহাতে বিরাগী হইয়া গেলেন। ইহাঁদিগের প্রকৃতিগত এপ্রকার বৈষম্য ছিল যাহাতে ইহাঁরা এরূপ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। প্রতাপ লোকধর্ম্মে সিদ্ধ হইতে চাহিতেন, অমরনাথের উচ্চ প্রকৃতি লোক-ধর্ম্মের উপরে থাকিতে চাহিত। প্রতাপ ধর্ম্মের শাসনে প্রকৃতিকে শাসিত করিতে চাহিতেন, অমরনাথের ধর্ম্ম প্রকৃতিকে পবিত্র করিত। প্রতাপ হৃদয়-মন্দিরে দেবভাব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কতই চেষ্টা করিতেন, অমরনাথের হৃদয়-মন্দিরে দেবভাব স্বতঃই উদিত হইত। প্রতাপ ধর্ম্মমন্দিরে প্রণিপাত করিতেন; অমরনাথ প্রকৃতির দেব-মন্দিরে মস্তক অবনত করিতেন। প্রতাপ ধর্ম্মের পূজা করিবার জন্য সংসারে প্রবেশ করিলেন; অমরনাথ প্রকৃতিকে পূজার্হ ও দেবতুল্য করিবার জন্য সংসার পরি-ত্যাগ করিলেন। প্রতাপ সংসারী, অমরনাথ ঋষি। প্রতাপ কার্য্যময়, অমরনাথ ভাবময়। প্রতাপ সাধুভাবের প্রশংসা করিতেন, অমরনাথ সাধুভাবে বিমুগ্ধ ও বি-গলিত হইয়া যাইতেন। প্রতাপ পিটর, অমরনাথ পাল। প্রতাপের নিকট স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ ছিল, তিনি চাবি খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিতেন; অমরনাথের নিকট স্বর্গের দ্বার বিমুক্ত ছিল, তিনি সোপানারোহণে তন্মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন। প্রতাপ যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অভ্যাস করিয়া প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিতে গিয়াছিলেন, অমরনাথ তাহা শিখেন

নাই। অমরনাথ প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া তাহার উপর জয়ী হইতে চাহিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া দেবভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকৃতির দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে চাহিত। অমরনাথ রামায়ণে সীতাকে উদ্ধার করিতেন, প্রতাপ সীতাকে বনবাসে পাঠাইতেন।

তরুণ বয়সে প্রণয় কেমন স্বাভাবিক ভাবে, স্বতঃই অনিবার্য্য রূপে হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় রজনীর জীবনে তাহাই প্রকাশিত করে। শকুন্তলার প্রণয় এইরূপ দুষ্মন্তকে দর্শন মাত্রে প্রোৎসাহিত হইয়াছিল, প্রোৎসাহিত হইয়া দিন দিন তাহা স্বতঃই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাস্তবিক হৃদয় যখন প্রণয়োন্মুখ হয়, উপযুক্ত প্রণয়পাত্র পাইবামাত্র তাহা সমুদ্গত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ দৃঢ় অনুরাগে পরিণত হইতে থাকে। ঋতুক্রমে যেমন বাসন্তী কুসুম একে একে প্রস্ফুটিত হইয়া বনরাজি সুশোভিত করে, ঋতুক্রমে মানব-হৃদয়ও তদ্রূপ প্রণয়ে কুসুমিত হইয়া জীবনকে মধুরতায় পরিপূর্ণ করে। সংসারের বাহিরে বনবাসিনী হইয়া থাকাতে শকুন্তলার নিকট বাহ্যসংসার অন্ধকারময় ছিল, তথাপি প্রণয় কেমন ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে সমুৎপন্ন হইয়া কুসুমে, লতাকুঞ্জে,তরুরাজিতে, হরিণীতে, এবং সখীগণে ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হইয়াছিল, কালিদাস তাহা অপূর্ব্ব কৌশলে এক অতুলনীয় দৃশ্যে কুসুম-সুকুমার তুলিকা-স্পর্শনে চিত্রিত করিয়াছেন। শকুন্তলা,

মাধবীর সহিত সহকারের বিবাহ দিতেন। মাধবী মুঞ্জরিত ও ফলপ্রসবিনী হইবে বলিয়া তাহার আলবালে জলসেচন করিতেন। হরিণীকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেন। কি ভাবে শকুন্তলা এই সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতেন, তাহা শকুন্তলাই বুঝিতেন। হৃদয় সেই ভাবে বিচলিত হইলে একদা শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের শুভদর্শন ঘটিল। দুষ্মন্তের উপর শকুন্তলার প্রণয় স্থাপিত হইল। যৌবনে এই প্রণয় বনবাসিনী শকুন্তলার হৃদয়ে স্বাভাবিকই সমুত্থিত হইয়াছিল ; যৌবনে সেই প্রণয় অন্ধরজনীর হৃদয়েও স্বতঃই সমুত্থিত হইয়াছে। সেই প্রণয় একবার উত্থিত হইলে তাহা কেমন স্বাধীন-ভাবে বর্দ্ধিত হয়, প্রণয়ভাজনের নিরপেক্ষ হইয়াও কেমন সুন্দর ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, শকুন্তলা ও রজনী তাহা দেখাইয়াছেন। দুষ্মন্তের প্রণয় কেবল ইন্দ্রিয়-লালসা মাত্র ছিল বলিয়া তাহা দুই দিনে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পরে ভুলিয়া-ছিলেন। কিন্তু শকুন্তলার প্রণয় কেবল লালসা মাত্র ছিলনা, তাহা প্রকৃত প্রণয় ও হৃদয়ের অমূল্য ধন দুষ্মন্তের অন্তরালে এবং অবর্ত্তমানেও তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহা দুষ্মন্তের প্রণয়ের অপেক্ষা করে নাই। শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের ভালবাসা কতদূর স্থায়ী, শকুন্তলা তাহা জানিতেন না; কিন্তু শকুন্তলার প্রণয় দুষ্মন্তকে ভালবাসিয়াই চরিতার্থ হইত। প্রণয়ের এই

চমৎকার ও সুন্দরভাব শকুন্তলা প্রকাশিত করিয়াছেন; অন্ধ রজনীও তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। রজনীর আদর্শ নিডিয়াতে (Nydia) তাহা অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিডিয়া গ্লকসকে (Glaucus) যে রূপ ভালবাসিত তাহা একজন অন্ধের ভালবাসা বলিয়াই শোভা পাইয়াছে; যেন পৃথিবীর মধ্যে গ্লকস ভিন্ন নিডিয়ার আর কিছুই ছিল না। গ্লকস সে ভালবাসার কিছুমাত্র জানিত না, গ্লকসের চিন্তা আয়ন (Ione) তথাপি নিডিয়া তাহাকে চিরদিন ভালবাসিয়াছে। আয়নের প্রতি গ্লকসের আসক্তি থাকাতে এই প্রণয়ের সৌন্দর্য্য অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছে। নিডিয়ার এতদূর প্রণয়-সৌন্দর্য্য রজনীর প্রণয়ে প্রভাসিত হয় নাই। শকুন্তলার প্রণয়ের উপর এক রেখা বর্ণ প্রয়োগ করিলে, রজনীর প্রণয়সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়; কিন্তু রজনীর প্রণয়ের উপর আর এক রেখা বর্ণপ্রয়োগ না করিলে নিডিয়ার প্রণয়-সৌন্দর্য্য অনুভূত হয় না। নিডিয়া কেবল গ্লকসকে ভালবাসিয়াই এই মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন। তিনি একদিনের তরে গ্লকসের হইলেন না। তিনি গ্লকসের হইলেন না বটে, কিন্তু চিরদিনের তরে মানব-হৃদয় অধিকার করিয়া রহিলেন। তিনি গ্লকসের সম্পত্তি নহেন, তিনি মানবজাতির সম্পত্তি।

নিডিয়ার নৈপ্রেমনৈরাশ্যে মানবের সহানুভূতি হওয়াতে মানব তাহার প্রণয়কে নিজ হৃদয়-মন্দিরে পবিত্র করিয়া

স্বার্থে। রজনীতে তাহা ঘটে না; কারণ, রজনীর প্রেম নিষ্ফল নহে। রজনী যথন পর-প্রার্থনীয়া হইলেন, সেই দণ্ড হইতে, পূর্ব্বে রজনী মানবহৃদয়ের যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে বিসর্জ্জিতা হইলেন। তিনি মানব-হৃদয় হইতে বিচ্যুতা হইয়া, একবার অমরনাথের এবং পরে চিরদিনের জন্য শচীন্দ্রের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শচীন্দ্রেরই হইয়া রহিলেন। তাহার কারণ এই, মানব পরদুঃখে যত দূর কাতর হয়, পরসুখে ততদূর সুখী হইতে পারে না। সুখ, মানব একাকী ভোগ করে; কিন্তু যে দুঃখ পায়, সে জগৎকে কাঁদাইয়া যায়।

আর এক কারণে নিডিয়া মানবের অধিকতর চিত্ত-হরণ করিয়াছে। বঙ্কিমবাবু রজনীকে অন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই অন্ধতার সহিত রজনীকে রূপ, ধন, মান, ঐশ্বর্য্য, গুণ সকলই দিয়াছেন। নৈসর্গিক গুণ ব্যতীত পার্থিব ধনসম্পত্তি নিডিয়ার কিছুই ছিল না। নিডিয়া কোন উচ্চবংশ-সম্ভূতা নহেন, কিন্তু তাহার গুণ-গ্রাম উচ্চকুলেরই সমুচিত। এই গুণরাশি তাহাকে উচ্চপদে উত্তোলন করিয়াছে। তিনি ইহার গৌরবে উচ্চকুলকামিনী অপেক্ষাও গরীয়সী। উচ্চকুলে যে উচ্চ-গুণের সমাবেশ হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু নীচকুলে নিডিয়ার গুণরাশি অতি আশ্চর্য্য মানিতে হয়। বঙ্কিমবাবু রজনীকে উচ্চকুলে তুলিয়া তাহার এই গৌরব কথঞ্চিৎ হরণ করিয়াছেন। নিডিয়াকে এই জন্য যেরূপে রমণীরত্ন

বলা যায়, রজনীকে সেরূপে বলা যায় না। উচ্চকুলোদ্ভবা হইয়া রজনী যে উচ্চগুণে ভুষিতা হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। যত দিন রজনী উচ্চকুল-সম্ভূতা বলিয়া জ্ঞানগোচর হন নাই, ততদিন তাহাকে পুষ্পনারীরূপে রমণীরত্ন বলিয়া জ্ঞান হইতেছিল। অবশেষে তাহার বংশ-মর্য্যাদার গৌরব আসিয়া তাহার গুণগরিমাকে লঘু করিয়া ফেলিল। নিডিয়া এই সমস্ত বাহ্যগৌরব বিহীন হওয়াতে তদীয় অন্তর্গৌরব দ্বিগুণ তেজে শোভা পায়। গভীর অরণ্যানীর অন্ধতম দেশের সুন্দর কুসুমের মত নিডিয়াকে উপলব্ধি হইতে থাকে—যাহার হৃদয় ও অন্তঃসৌন্দর্য্যই সর্ব্বস্ব। এ সৌন্দর্য্য নিরলঙ্কৃত বেশে সমুদ্রতীরে সন্ধ্যা-কালে পূর্ণিমার শশীর ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। এই নিরলঙ্কৃত সরল আন্তরিক সৌন্দর্য্য, নিডিয়ার অন্ধতা, রূপহীনতা এবং দুর্ভাগ্যের বিমলিন দেশ হইতে দ্বিগুণ গৌরবে প্রজ্বলিত দেখায়। তাহাকে কেবল আন্তরিক সৌন্দর্য্যের অবয়বী কল্পনা বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে।

এই পাপ-পৃথিবীতে কামিনী শুদ্ধ গুণে বিকায় না, নিডিয়া তাহা দেখান। নিডিয়া সেই পাপ-পৃথিবীকে যেন ভৎর্সনা করিয়া গেলেন। তিনি যেন আজিও কহিতেছেন, পৃথিবি! তুমি আমার অন্তঃসৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলে না! আমি কি একাকী অন্ধ? জগৎ তুমিও অন্ধ। আমি, জগৎ! তোমাকে দেখিতে পাই নাই; এবং তজ্জন্য কতই সন্তাপিত হইয়াছি; তোমার নয়ন

থাকিতেও তুমি আমার প্রতি বারেক দৃষ্টিপাত কর নাই, আমার জন্য বিন্দুমাত্রও অশ্রুপাত কর নাই। প্রকৃতি! আমাকে এত গুণাধার করিয়া কেন সৃষ্টি করিয়াছিলে!

প্রথমে আমরা রজনীর গুণমাত্রে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরে দেখিলাম তাহার রূপও আছে, ক্রমে তাহার ধন সম্পত্তি ও কুলমর্য্যাদা সকলই প্রকাশিত হইতে লাগিল। বাহ্য চাক্‌চিক্যে আমাদিগের দৃষ্টি পড়িল। আমরা রজনীর গুণরাশি ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম। এমত সময় অমরনাথ উদিত হইয়া আমাদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। অমরনাথ রজনীর কেবল গুণাংশে মোহিত হইয়া, রজনীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা আমাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু তৎপরেই ইহা ভুলিয়া গেলাম। তাহার রূপ, ধন, মান দেখিয়া আমরা শচীন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলাম। গুণ অপেক্ষা রজনীর রূপ, এবং ধন মানের গরিমা বাড়িল। উপন্যাসের কি কল্পনা এই? উপন্যাসের যদি ইহাই কল্পনা হয়, তবে যে উপদেশ নিডিয়া দেয়, রজনীও তাহাই প্রদান করে বটে, কিন্তু রজনীর অপেক্ষা নিডিয়ার উপদেশ অধিকতর গম্ভীর, আকর্ষণীয়, এবং দৃঢ় বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। রজনী নিজে অন্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু অমরনাথ থাকিতে তিনি জগৎকে অন্ধ বলিতে পারেন নাই। অমরনাথ মানবের ঔদার্য্য এবং গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়া মানব-প্রকৃতিকে উচ্চপদে তুলিয়াছেন।

নিডিয়া যে গুণগ্রামের সৃষ্টি, গিরিজায়া তাহার এক গুণ পাইয়া ভিখারিণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। নিডিয়ার সহিত যখন আমাদিগের প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমরা নিডিয়ার সুকণ্ঠরবে এবং সুধার সঙ্গীতে বিমোহিত হইয়া যাই। ক্রমে আমরা নিডিয়ার উচ্চতর গুণের পরিচয় পাইলাম। তখন আমরা নিডিয়ার সঙ্গীত-শক্তি ভুলিতে লাগিলাম; কিন্তু প্রথমে নিডিয়া আমাদিগকে যে গুণে মোহিত করিয়াছিলেন, অন্য শ্রেষ্ঠতর গুণ না থাকিলেও আমরা সেই গুণেই তাহার নিকট বিক্রীত থাকিতাম। এই জন্য বঙ্কিমবাবু তাহার সেই গুণমাত্র বাছিয়া লইলেন, এবং তদ্দ্বারা গিরিজায়ার সৃষ্টি করিলেন। সে গুণ বঙ্গসমাজে কেবল ভিখারিণীতে শোভা পায় বলিয়া তাহা রজনীকে দিতে পারিলেন না। রজনীর জন্য নিডিয়ার অন্যান্য গুণ রাখিলেন। যে সরলতায় নিডিয়া সাহসিনী ও স্বাধীন, সে সরলতা, সাহস ও অবশ্যতা রজনীর ছিল। যে স্বাভাবিক প্রতিভা প্রভাবে নিডিয়া সকল অবস্থার উপর জয়লাভ করিয়াছেন, রজনীও সেই প্রতিভাবলে প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া সকল অবস্থাই অতিক্রম করিয়াছেন। নিডিয়া যেমন নিজ বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি পরায়ণ ছিলেন, রজনীরও প্রকৃতি ঠিক তদ্রূপ। নিডিয়া যেমন একাধারে অনভিজ্ঞতার সহিত প্রতিভার মিলন, কোমলতার সহিত দৃঢ়তা ও কর্কশতার মিলন, বাল্য চঞ্চলতার সহিত বয়সের সুধীরতার মিলন—

অতি আশ্চর্য্য ভাবে প্রদর্শন করেন, রজনীও তদীয় অনতিপ্রসর জীবন-ক্ষেত্র মধ্যে অধিকতর চমৎকার রূপে তৎ সমুদয় প্রকাশিত করেন। নিডিয়ার হৃদয় যেমন এক এক বার ভাববেগে উদ্দামিত হইত, এক এক বার সৌকুমার্য্যের সুন্দরতায় বিকসিত হইত; ঝঞ্ঝাবাত এবং বৃষ্টির পর সুন্দর প্রকৃতি-শোভা, এবং বাসন্তী প্রকৃতির শোভা মধ্যে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টিধারা পর্য্যায়ক্রমে দেখা যাইত, রজনীরও অল্পপ্রসর হৃদয়াকাশে একবার প্রণয়ের প্রবল ভাবের বাত্যা বহিত, আবার সৌকুমার্য্য বিকসিত হইয়া অমরনাথের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিত। জীবনের ঘটনাসকল বিভিন্ন হওয়াতে এই হৃদয়দ্বয়ের পরিচয় বিভিন্ন অবস্থাতে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র, নহিলে ইহারা যে এক ধাতুতে গঠিত তাহার আর সংশয় নাই। রজনীর ক্ষুদ্রপ্রসর জীবন মধ্যে যেরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে বঙ্কিমবাবু নিডিয়ার গুণগ্রামের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বঙ্কিমবাবুর চিত্রনৈপুণ্যে চমৎকৃত হইতে হয়।

অন্ধের অনুরাগ, অন্ধের প্রেম—কেমন গভীর ও প্রগাঢ়, নিডিয়া এবং রজনী উভয়েই তাহা প্রদর্শন করেন। অন্ধ বলিয়া উভয়েই জানিত তাহারা পরকেই চিরকাল ভালবাসিবে, পর যে তাহাদিগকে আবার ভালবাসিবে তাহারা এরূপ প্রত্যাশা করে নাই। সেই জন্য তাহাদিগের প্রেম চিরদিন গোপনেই হৃদয়ের গূঢ়তম

দেশে পোষিত হইয়াছিল। সে প্রেম প্রকাশ হইবার নহে বলিয়া তাহার তেজ ও প্রাবল্য কখন পরিদৃশ্যমান হয় নাই। বাহ্যবল ছিলনা বলিয়াই অনুদিন তাহার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই প্রেম কতদূর প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল বঙ্কিমবাবু একস্থলে তাহার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। লবঙ্গলতা বলিতেছেন আমি রজনীকে বলিলাম, আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব। ইহা শুনিয়া "রজনী দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল, অন্ধ নয়ন মুদিল। তার পর, তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল—চক্ষের জল আর ফুরায়না। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। রজনী কথা কহে না, কেবল কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রজনি! অত কাঁদ কেন?

"রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, সেদিন গঙ্গার জলে আমি ডুবে মরিতে গিয়াছিলাম, ডুবিয়াছিলাম লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য। তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীন্দ্র চাহিতাম * * * *। অন্ধের দুঃখের কথা শুনিবে কি?

"আমি রজনীর কাতরতা দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলাম, শুনিব।

"তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে, হৃদয় খুলিয়া, আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের

স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ, তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, উদ্ধার, সকল বলিল। বলিয়া বলিল—ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে, চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি ?”

রজনীর এই প্রেমগভীরতার পরিচয় পাইয়া লবঙ্গলতা মনে মনে নিশ্বাস ফেলিলেন। লবঙ্গ যে গভীরতর প্রণয় হৃদয়ের গভীরতম দেশে প্রচ্ছন্ন করিয়া পুষিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সেই প্রণয় একবার উথলিয়া পড়িল। কিন্তু লবঙ্গ অমনি তাহা হৃদয়ের গভীর প্রদেশে পুনরায় ঢালিয়া দিলেন। মনে মনে বলিলেন “কাণি ! তুই ভালবাসার কি জানিস্ ! তুই লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী।” লবঙ্গলতার এ প্রণয় যে রজনীর প্রণয়াপেক্ষাও গভীরতর ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। এ-প্রণয় কেবল প্রতাপের গভীর শৈবলিনী-প্রেমের সহিত তুলনীয়। আর যদি কাহারও সহিত তুলনীয় হয়, তবে এক দিন চন্দ্রশেখরের প্রণয়ের সহিত তুলনীয় হইতে পারে।

রজনীর এই প্রণয়-অহঙ্কার নিডিয়ায়ও ছিল। নিডিয়া কেবল মনে মনে তাহার স্পর্দ্ধা করিতেন। গ্লকস্ সে প্রণয় জানিতে পারিল না বলিয়া ক্রুদ্ধ হইতেন। রজনীর ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত এই প্রণয়ের অহঙ্কার কেমন শোভনীয় দেখায় ! এই অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়াই তিনি ধীরতা ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেন। এই অহঙ্কারে

মত্ত হইয়া একদিন ডেস্‌ডিমোনা জনকেরও মুখ ম্লান করিয়া প্রিয় জনের মান বাড়াইয়াছিলেন।

যে সাহসে ডেস্‌ডিমোনা একদা সর্ব্বসমক্ষে কৃষ্ণকায় মুরকে প্রিয়জন স্বীকার করিয়া পিতৃ-সন্নিধান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, রজনীও একদিন সেই সাহসে অমরনাথের সমক্ষে স্পষ্টই বলিলেন 'অমরনাথ, আপনি যদি সহস্র গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তথাপি আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার যোগ্য নহি। সেই কথাটি আপনার শুনিতে বাকি আছে।" ইহার পর আর তিনি বলিতে পারিলেন না। লবঙ্গ ঠাকুরাণীর উপর ভার দিলেন। রজনী অমরনাথকে জীবনদাতা বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাহার নিকট সহস্র ঋণে আবদ্ধ ছিলেন; তজ্জন্য তিনি অমরনাথের নিকট আপনাকে বিক্রীত জ্ঞান করিতেন। তাহার জন্য প্রাণপাত করিতেও অগ্রসর ছিলেন। কিন্তু যে প্রণয় তিনি শচীন্দ্রকে দিবেন, তাহা তিনি অমরনাথকে দিতে পারেন নাই। অমরনাথ তাহার কৃতজ্ঞতার পাত্র, প্রণয়ের পাত্র নহেন। যে ভক্তি জনকের প্রাপ্য, সে ভক্তি ডেস্‌ডিমোনা জনককে দিয়াছিলেন, কিন্তু যে প্রণয় পতির প্রাপ্য, তাহা আর কাহাকেও দিতে পারেন নাই। রজনীও অমরনাথের ঋণ অমরনাথকে পরিশোধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু যে হৃদয়

তিনি শচীন্দ্রের জন্য রাখিয়াছিলেন, তাহা শচীন্দ্রকেই দিয়া সুখী হইলেন। অমরনাথ একদিন ডেস্‌ডিমোনার চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এচিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা সকলই আছে, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কই? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই?" অমরনাথ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যে এই সাহস ও এই অহঙ্কার কোন জীবিত ডেস্‌ডিমোনাতে দেখিয়া তাহাকে একদিন শিহরিতে হইবে।

লর্ড লিটন বোধ হয় তাঁহার পুষ্পনারীর কল্পনা শেলি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। শেলির সুকোমল কবির হৃদয় একটি সুকোমল রমণীরত্ন সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কোমলতর লজ্জাবতীর কুসুমকাননে স্থাপিত করিয়াছিল। তাহার সুকুমার কর-স্পর্শে কোমলতর বৃন্ত ও কুসুমাবলি লালিত হইত এবং কেবল লজ্জাবতীই জানিতে পারিত কে তাহার সুখবর্দ্ধন সুসম্পন্ন করিতেছে। এই পুষ্পনারী যেন লজ্জাবতীর সোহাগিনী ছিল। লজ্জাবতী তাহাকে দেখিয়া যেন প্রফুল্ল হইত, তাহার করস্পর্শে যেন সুখিনী হইত। এরূপ সুকুমারী নারীরত্নের কল্পনা কেবল শেলির ন্যায় কবিরই সম্ভবে। লর্ড লিটন বোধ হয় এই কল্পনাকে কোমলতর মানসিক গুণে বিভূষিত করিয়াছেন, এবং সেই লজ্জাবতীলতার ন্যায় নিডিয়ার হৃদয় কভু সঙ্কুচিত, কভু বিস্ফারিত, কভু প্রফুল্লিত করিয়া দেখাইয়াছেন। নিডিয়া

গ্রকসের সুন্দর কুসুম-কানন পরিসেবিত ও সুশোভিত করিতেন। কুসুম সকল তাহার করস্পর্শে যেন সুন্দরতর হইয়া ফুটিত *। শেলির পুষ্পনারী লজ্জাবতীর কুসুম-কাননে বনদেবী রূপে প্রতীত হইত। নিডিয়া ও গ্রকসের সুন্দর কুসুম-কাননের বনদেবী। বঙ্কিমবাবুর রজনী কিন্তু তাহা নহে। তাহাকে কোন খানে বনদেবী রূপে প্রতীত হয় না। বোধ হয় এতদ্দেশীয় সাহিত্যে এত বন-দেবীর কল্পনা আছে যে তিনি রজনীকে আর বনদেবী রূপে দেখাইতে চাহেন নাই। নিডিয়ার চরম কল্পনা কালিদাসের শকুন্তলা দেখাইয়াছেন। শকুন্তলা পুষ্প-নারীর অতি পরিস্ফুট কল্পনা। সেই শকুন্তলাতে আবার কেমন কতকগুলি এতদ্দেশীয় মধুর, সলজ্জ, কোমল ভাব আছে যাহা নিডিয়াতে নাই। থাকিবার সম্ভাবনা নহে। যে হেতু নিডিয়া ইংরাজী কল্পনা। শকুন্তলা ভারতের মাধুরী কল্পনা। বঙ্কিমবাবু জানিতেন, কালিদাসের এই সুন্দরী শকুন্তলার নিকট তিনি কখনই যাইতে পারিবেন না। শকুন্তলা ভারতের কবিত্ব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। কাদম্বরীও শকুন্তলার কাছে যাইতে পারেন নাই। বনবাসিনী সীতাও রামাশ্রমে এমত মোহিনীবেশে বিচরণ করিতে পারেন নাই। ইহার কাছে শেলি পরাভূত, লর্ড লিটনও পরাভূত। ভারতবাসীর হৃদয়ে বনবাসিনী

* Vide Paradise Lost Book VIII, Verses 44—47.

শকুন্তলার মোহিনী কল্পনা যতকাল বিরাজিত থাকিবে, ততকাল কোন নিডিয়াই তাহার চিত্ত হরণ করিতে পারিবে না। বঙ্কিমবাবু ইহা বিলক্ষণ জানিয়া রজনীকে কেবল মালা গাঁথিতে দিয়াছেন, কুসুম-কাননে তাহাকে বিচরণ করিতে দেন নাই। একজন পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, রজনী কেবল মালা গাঁথিয়া দিতেন। নিডিয়ার ন্যায় তিনি কুসুম-কাননে জলতরঙ্গের মত প্রতি কুসুমতরুর সমক্ষে গিয়া পুষ্প চয়ন করিতেন না, শকুন্তলার ন্যায় আলবালে জলসেচন করিতেন না, সহকারের সহিত মাধবীর বিবাহ দিতেন না, খেলির পুষ্পনারীর ন্যায় কোমল বৃন্ত সকলকে করস্পর্শে আনন্দিত করিতেন না, এবং কুসুম ও কোমল বৃন্তের কীট হরণ করিতেন না। তিনি কেবল পুষ্পচয়ন করিতে জানিতেন। কুসুমই তাহার আনন্দ এবং কুসুম-গ্রন্থনই তাহার বিনোদন।

নিডিয়া হইতে রজনী যে যে বিষয়ে বিভিন্ন তাহা আমরা অনেক দূর আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সমস্ত বৈলক্ষণ্য সত্বেও স্থূল বিষয়ে ইহাদিগের কত সৌসাদৃশ্য তাহাও সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক পরিমাণে প্রতীত হয়, রজনী আর কিছুই নহে, ইহা বঙ্কিমের নিডিয়া। কিন্তু এই বঙ্কিমের নিডিয়া যে গুণে লিটনের নিডিয়া হইতে একেবারে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, সে গুণের বিষয় এখনও আলোচিত হয় নাই। যেমন ভগিনীদ্বয়ে অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও,

তাহাদিগের বৈসাদৃশ্য এত অধিক ও উজ্জ্বল যে তাহাদিগকে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বিলক্ষণ চেনা যায়, রজনীকে তদ্রূপ নিডিয়া হইতে বিলক্ষণ পৃথক্ করা যায়। বঙ্কিমবাবু রজনীতে এমত একটী নিজভাব প্রদান করিয়াছেন, যাহাতে রজনী আর নিডিয়া নাই, তাহা বঙ্কিমবাবুর রজনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে গুণ রজনীর চিন্তাশীলতা, তাহা রজনীর শ্রেষ্ঠতর-প্রতিভা-সমুৎপন্ন নৈতিক তত্ত্ব দেখিবার আশ্চর্য্য শক্তি।

প্রতিভা, নিডিয়ারও ছিল। নিডিয়া সেই প্রতিভা বলে পার্থিব ঘটনার উপর জয়লাভ করিতেন। তিনি প্রতিভালোকে বিপদের মাঝে পথ দেখিয়া লইতেন। তাহার নিকট বাহ্যজগৎ অন্ধকারময় ছিল বটে, কিন্তু অন্তর্জগৎ পূর্ণ আলোকিত ছিল। তিনি সেই আলোকে বাহ্যজগৎ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন। যাহা আয়ন, গ্লকস দেখিতে পাইতেন না, তিনি তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেন, আয়নকে সাবধান ও সতর্ক করিয়া দিতেন, আরবেসিসের কুহকজাল ভেদ করিতে পারিতেন, গ্লকসের ভবিষ্য বিপদ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেন। এই প্রতিভা রজনীরও ছিল। তিনি এই প্রতিভাপ্রভাবে হীরালালের উপর জয়লাভ করিয়াছেন। এই প্রতিভা-প্রভাবে তিনি সাহসভরে গোপালের সহিত বিবাহ অতিক্রম করিয়া নিজ প্রেম ও হৃদয়ের বিমলতা এবং সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতিভা, তাহাকে অজ্ঞানতঃ

সৎপথে রাখিয়াছে। প্রতিভা, তাহাকে অজ্ঞানতঃ অমরনাথের প্রতি কর্ত্তব্য এবং শচীন্দ্রের প্রতি কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিয়াছে। রজনীর প্রতিভা শুদ্ধ ইহাতেই নিবদ্ধ নহে, নিডিয়ার প্রতিভা অপেক্ষা তাহা কিছু শ্রেষ্ঠতর ছিল, সেই শ্রেষ্ঠতায় তাহা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। যে প্রতিভালোকে যোগী ও ঋষিগণের হৃদয়ে অপূর্ব্ব সত্য সকল, অপূর্ব্ব ভাব সমুদায় উদিত ও প্রতিভাত হইত, রজনীরও মনে সেই প্রতিভালোকে অপূর্ব্ব চিন্তাপরম্পরা উদিত হইয়া নৈতিক রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় প্রকাশিত করিত। তাহার প্রতিভা প্রতি ঘটনায় তাহাকে অপূর্ব্ব চিন্তাপথে লইয়া যাইত। নির্জ্জন শান্তিপথাবলম্বী সংসারবিরাগী বিষণ্ণ ঋষি-হৃদয়ের যে চিন্তাপ্রণালী, রজনীহৃদয়ে সেই চিন্তাপ্রণালী কোথা হইতে অনুসৃত হইত। রজনী প্রতিভাবলে, সেই চিন্তাবলি দ্বারা অপূর্ব্বরূপে নৈতিক রাজ্যের রহস্য সকল ভেদ করিতেন। তাহার রহস্যোদ্ভেদ দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহার সেই চিন্তাশীলতায় একদা নির্জ্জনতা, বিষণ্ণতা, ও শান্ত হৃদয়ের পরিচয় দেয়। নিডিয়া অপেক্ষা তাহাকে অধিকতর নির্জ্জন, বিষণ্ণ, ও শান্তপ্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। প্রতিভাসম্পন্ন সহৃদয় ব্যক্তিগণ অন্ধকারে নক্ষত্রের মত নিগূঢ় নৈতিক তত্ত্বসকল যেমন দেখিতে পান, রজনীর চিন্তাশীলতায় যেন সেইরূপ এক একটী নক্ষত্র ফুটিত। জীবনের বিষণ্ণ ঘটনার উপর

রজনী চিন্তা করিতেন,—সরল প্রতিভাসম্পন্ন বিষণ্ণ হৃদয়ের চিন্তা। চিন্তা সকল স্বাভাবিক সেই ঘটনা হইতে পর পর উদিত হইত। সেই সকল চিন্তা একদা প্রতিভা, কোমল সহৃদয়তা, বিষণ্ণতা এবং অপূর্ব্ব অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিত। এই দেখুন সেই অন্ধ যুবতী, একাকিনী জনহীনা রাত্রিতে যেখানে হীরালাল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া, গঙ্গার কল কল জল-কল্লোল শুনিতে শুনিতে কি ভাবিতেছেনঃ—

"হায় মানুষের জীবন! কি অসার তুই! কেন আসিস্—কেন থাকিস্—কেন যাস্? এ দুঃখময় জীবন কেন? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। * * * *। জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া অসার তাহা নহে। শিমুল গাছে শিমুল ফুলই ফুটিবে তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এইজন্য, যে দুঃখই দুঃখের পরিণাম—তাহার পর আর কিছুই নাই। আমার মর্ম্মের দুঃখ আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিনা--সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। * * * *। এই সংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কেন? এ সকল কাহার খেলা? দেবতার? জীবের এত

কষ্টে দেবতার কি সুখ? কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কি সুখ? মূর্ত্তিমতী নির্দ্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব? কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে—তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। তবে কি আমার কর্ম্মফল? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ?"

অন্য এক স্থলে দেখুন প্রাকৃতিক দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে তত্ত্ব অনেক পরীক্ষা ও গবেষণার পর সমুদ্ধার করিয়াছেন, রজনী কেমন সেই তত্ত্ব স্বাভাবিক প্রতিভা ও সহৃদয়তা প্রভাবে আপনা আপনি দেখিতে পাইতেছেন:—

"তোমরা বুঝ না, বুঝাইবে কে? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র—শব্দও মানসিক বিকার, রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে এক জনকে সকলেই সমান রূপবান দেখে না কেন? একজনে সকলে আসক্ত হয় না কেন? সেইরূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটী মনের সুখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে?"

নিডিয়ার প্রতিভা এত তেজস্বিনী নহে। এই প্রতিভার সহিত নিডিয়ার প্রতিভা তুলনা করিলে তাহাকে তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি বলিয়াই প্রতীত হয়। রজনীর সুকুমার হৃদয়ে

নৈতিক তত্ত্বের সৌকুমার্য্য স্বতঃই অনুভূত হইত। হৃদয়ের এতদূর সৌকুমার্য্য কেবল কামিনীরই সম্ভবে। এই সৌকুমার্য্য এতদূর কোমল যে তাহাতে সুকোমল নৈতিক তত্ত্ব সকল প্রতিভাসম্পন্ন প্রতীতির ন্যায় আপনা আপনি উদয় হইত। তাহা অনুভব করিতে শিক্ষা অথবা উপ-দেশের আবশ্যক হইত না। চিন্তাপরম্পরায় তাহা একে একে সান্ধ্য তারকাবলীর ন্যায় হৃদয়গগনে উদয় হইত। ইহাই প্রতিভা—হৃদয়ের এতদূর সৌকুমার্য্য—যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান আপনা আপনি অনুভূত হয় এবং স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতীত হয়—ইহাই প্রতিভা। রজনীর এই প্রকার সৌকুমার্য্য ও প্রতিভা ছিল; নিডিয়ার তাহা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রজনীর চিন্তাশীলতা, বিষণ্ণতা এবং শান্তভাবেও তাহাকে নিডিয়া হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে। নিডিয়াতে এই কতিপয় গুণের বর্ণ প্রয়োগ করিয়া বঙ্কিমবাবু রজনীকে আপনার করিয়া-ছেন। নৈপুণ্য এই যে, এই গুণপরম্পরা রজনীর শরীরে স্বাভাবিক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। চিত্র কোনস্থলে কাল্পনিক বোধ হয় না।

এই শান্তমূর্ত্তি রজনীর পার্শ্বে একটী স্বর্ণপ্রতিমা প্রভাসিত আছে—সে প্রতিমা উজ্জ্বল লবঙ্গলতা। উপন্যাস মধ্যে লবঙ্গ যেখানে উঠিয়াছেন সেই খানেই পাঠকের হৃদয়াম্বরে বিজলী খেলিয়াছে। সেই ভুবনেশ্বরী শুদ্ধ যে মিত্রজার পুরী লক্ষ্মীর ন্যায় আলোকিত করিয়া-

ছিলেন এমত নহে, তিনি সকলের গৃহ আলোকিত করিতে চাহিতেন, তিনি পাঠকেরও হৃদয় উজ্জ্বল গুণে আলোকিত করিয়াছেন। তিনি নবীনা যুবতী, কিন্তু তাহার যৌবন-সুলভ চঞ্চলতা ছিল না। তাহার প্রকৃতিতে কেমন এক গম্ভীর ভাব আছে যাহাতে তাহাকে গৃহিণীর উপযোগিনী করিয়াছিল। অথচ তাহার গাম্ভীর্য্যে প্রফুল্লতা ছিল। বিষণ্ণতা কেমন, লবঙ্গ-লতা তাহা কখনই জানিতেন না। তিনি বয়স গুণে প্রফুল্ল, অথচ আমোদিনী নহেন। ঈষৎ-হাস্য-বিস্ফারিত বদন-বিভায় সকলকে মোহিত করিয়া তিনি কার্য্যোদ্ধার করিতেন। লবঙ্গলতা বয়স ও প্রকৃতি-গুণে সর্ব্ব বিষয় শোভিত, সুন্দর, আশাপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ দেখিতে চাহিতেন। তিনি যে শুদ্ধ ভালবাসিতেন বলিয়া বৃদ্ধ স্বামীকে নবীন সাজে সাজাইতেন, গ্রন্থকারের একথা সত্য নহে। তিনি ভালবাসার রঞ্জনে যুবতীর ইচ্ছা মিশাইতেন। ইচ্ছা মিশাইয়া যাহাকে ভালবাসিতেন তাহাকে নিজ ইচ্ছানু-যায়ী শোভিত করিতেন। ইহাই যুবতীর কার্য্য, ইহা লবঙ্গলতার প্রকৃতির গুণ। লবঙ্গ নিজে সুখিনী, পরকেও সুখী করিতে ভালবাসিতেন। তিনি নিজের সুখে সন্তুষ্ট নহেন; চারিপার্শ্ব সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেখিতে চাহি-তেন। তাহার সহৃদয়তা ও কৃপাময়ী প্রকৃতির এই অর্থ। সম্পত্তি ও সুখ নহিলে ললিত লবঙ্গলতা জন্মে না, বর্দ্ধিত ও পরিণত হয় না; ভুবনেশ্বরীও তদ্রূপ সমৃদ্ধিতে লালিত,

ও প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। দুঃখের ভয়ে তিনি সশঙ্কিত হইতেন, এই জন্য রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহ দিতে এত ব্যস্ত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার সুখ-প্রকৃতিতে দীনতার বিশুষ্ক বায়ু অসহ্য বোধ হইত। লবঙ্গলতা সমৃদ্ধির সরস মলয়-হিল্লোলে দুলিতে ও নাচিতে ভালবাসিতেন। তিনি সেইরূপ দুলিয়া দুলিয়া মিত্রজার আলয় সুখে পূর্ণ করিয়াছিলেন, রজনীর গৃহে আনন্দ সঞ্চার করিতে আসিতেন, অমরনাথের হৃদয় আত্ম-বিস্মৃতির আনন্দে দোলাইয়া দিতেন। ললিত লবঙ্গলতা ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া মধুর হাসিতে হাসিতে "আহ্লাদায়িনী, রাজরাজেশ্বরী, ইন্দ্রাণীর" মত অমর-নাথের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন; অমরনাথ ক্ষণিক আত্ম-বিস্মৃতির আনন্দে ডুবিয়া যাইতেন। লবঙ্গের সুখ, গঙ্গার তরঙ্গের ন্যায় সমুদায় হৃদয় ধারণ করিতে পারিত না; তাহা উথলিয়া পার্শ্বদেশ উর্ব্বর, সম্পত্তিশালী ও সুখী করিয়া দিত।

লবঙ্গের এই কৃপাময়ী পরসুখদায়িনী প্রবৃত্তি এত প্রবল ও উজ্জ্বল ছিল, যে ইহাতেই তাঁহাকে উজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার যৌবনের অনুরাগ এই স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছিল। বয়সের চঞ্চলতা এই স্রোতস্বিনীকে বেগবতী করিয়াছিল। তাঁহার এই প্রবৃত্তি-জনিত কার্য্য-পরম্পরা ব্রত-পালিত বলিয়া তত বোধ হইত না, তাহা যেন স্বভাবজাত ও অনায়াস-

সাধিত বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি ইচ্ছা করিয়া এই কার্য্য-পরম্পরায় প্রবৃত্ত হইতেন না; কিন্তু তাঁহার দয়াবতী প্রকৃতি ইচ্ছারও অগ্রগামিনী ছিল। তিনি কাণা ফুলওয়ালী-গ্রথিত কদর্য্য মালার মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিতেন। ফিরাইয়া দিতে গেলে সে ভুল অস্বীকার করিতেন। ইচ্ছা তাঁহার হস্তপদকে সৎপথে চালনা করিত না, কিন্তু তাঁহার হস্তপদ অভ্যাস প্রভাবে সৎপথে আপনা আপনি চালিত হইলে ইচ্ছা সে চালনার অনুমোদন করিত। লবঙ্গের দয়াপ্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাবজাত অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল।

লবঙ্গ নিতান্ত পতি-অনুরাগিণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দয়াবতী প্রকৃতি এত উজ্জ্বলা ছিল, যে তাঁহার অসাধারণ পতিভক্তি সে উজ্জ্বলতায় প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমরা লবঙ্গকে তত পতিভক্তিশীলা বলিয়া জ্ঞান করি না, তিনি অন্যান্য সংস্কারে আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়েন। লবঙ্গের নাম করিবা মাত্র দেখিতে পাই, একটি রমণীরত্ন হিতব্রতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার পতিভক্তি প্রবল ছিল বটে; কিন্তু তাঁহার স্নেহ, মমতা, দয়া প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তি সমুদায় বোধ হয় ততোধিক প্রবলা ছিল। যাহার বাহ্য বিকাশ অধিকতর তাহাই খ্যাতি লাভ করে; সুতরাং তাঁহার পতি-পরায়ণতা দয়ার নিকট প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার সতিনের প্রতি কুব্যবহার কোন স্থলেই দৃষ্ট হয় নাই। তিনি সতিনিপুত্র

শচীন্দ্রকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাহার মমতা এত মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিত যে তাহার মুখরতা সেই মমতারই অঙ্গ বলিয়া বোধ হইত। যে ভালবাসে সেই আপনার ভাবিয়া কটু কহিতে পারে। লবঙ্গের মুখরতা সেই মমতারই চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ পাইত। লবঙ্গের সহিত যাহারই আলাপ পরিচয় হইত, তাহাকেই আপনার জ্ঞান করিতেন। আপনার জ্ঞান করিতেন বলিয়াই বিষময়-বাক্য-প্রয়োগে সাহসিনী হইতেন। তিনি বোধ হয় জানিতেন না যে সেরূপ বাক্য-প্রয়োগে পরের মনোবেদনা ঘটে। যদি জানিতেন, তবে তাহা কোন মঙ্গলময় উদ্দেশ্যের কৌশল বলিয়া তৎপ্রয়োগে নিরত হইতেন। যে কারণে তাহা প্রয়োগ করিতেন, সে কারণ হৃদয়ে অধিকতর প্রবল, প্রবল কিন্তু নিতান্ত প্রচ্ছন্ন। এইজন্য রজনী কতবার গালি খাইয়াছেন, অমরনাথ নিদারুণ চোর-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছেন। বাল্য-চাপল্যে ক্রীড়া-কৌতুকিনী হইয়া তিনি অমরনাথের প্রতি যে অযোগ্য নির্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য চিরজন্ম অনুতাপিনী ছিলেন। একদিন সে অপরাধের জন্য অমরনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সুমহান্ অমরনাথও পূর্ব্ব ভালবাসার অনুরোধে তাহা ক্ষমা করিয়াছিলেন।

লবঙ্গ বহুরূপিণী। তিনি রাম-সদয়ের নিকট আদরের আদরিণী, শচীন্দ্রের নিকট জননী, অপরের নিকট

গৃহিণী, এবং অমরনাথের নিকট সুরসিকা পতিপ্রাণা রমণীরত্ন। যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার সমুচিত, লবঙ্গ তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। লবঙ্গ বহুরূপিণীর ন্যায় ক্ষণিকের মধ্যে আপনাকে পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন। এই মাত্র রজনীর সহিত কর্ত্রীর মত কথাবার্ত্তা কহিতে-ছেন, যেই অমরনাথ উপস্থিত, অমনি আপনাকে অমরনাথের উপযোগিনী করিয়া লইলেন। কর্ত্রীর রূপ পরিত্যাগ করিয়া রসিকা যুবতী সাজিলেন। এই মাত্র রাজচন্দ্রের স্ত্রীর নিকট গৃহিণীরূপে সম্ভাষণ করিতেছেন, পরক্ষণেই দেখি শচীন্দ্রের নিকট পরম স্নেহময়ী জননী সাজিয়াছেন। এই মাত্র দেখি রামসদয়ের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয় গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় ঝম্ ঝম্ করিয়া, রামসদয়ের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিতেছেন; প্রাচীন পতিকে রাশি রাশি ফুল কিনিয়া, যুবতী নাতিনীর মত সাজাইতেছেন; পরে দেখি ফুলওয়ালী রজনীর সমক্ষে বিলক্ষণ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে গালি দিয়া কাঁদাইতেছেন। বাস্তবিক তিনি উপাখ্যান মধ্যে কখন জননী, কখন গৃহিণী, কখন রসিকা যুবতীর কার্য্যাদি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়া যাইতেছেন; ততদূর চাতুরী ও নৈপুণ্য আমরা এমন নবীনা যুবতীর নিকট প্রত্যাশা করি নাই। তিনি যুবতীর অঙ্গে জননীর প্রৌঢ়তা মিশাইয়াছিলেন, নবীনার অঙ্গে গৃহিণীর গাম্ভীর্য্য মিশাইয়াছিলেন, এবং গৃহিণীর অঙ্গে যুবতীর

রঙ্গরস মিশাইয়াছিলেন। তিনি যৌবনের সহিত বয়সের পরিণতি, চপলতার সহিত গাম্ভীর্য্য, কর্কশতার সহিত মধুরতা, এবং তরুণবয়সের সহিত বিজ্ঞতা ও কৌশল অতি সুন্দরভাবে মিশাইয়া আপনাকে এক অদ্বিতীয়া রমণীরত্ন করিয়াছিলেন।

কিন্তু লবঙ্গ গর্ব্বিতা ছিলেন। এ গর্ব্ব, যৌবন ও রূপের গর্ব্ব নহে। সাধুতা ও সদ্‌গুণের যে গর্ব্ব মনে আপনাআপনি উদয় হয়, উদয় হইয়া অন্তরে অন্তরে মনকে ফুলাইয়া রাখে, প্রকৃতিকে তেজস্বিনী করে, বাঙ্গালিনীকেও সাহসিনী করে এবং কুলবধূকেও ঈষৎ স্বাধীনতা দেয়, সেই গর্ব্ব লবঙ্গলতার ছিল। লবঙ্গ সেই গর্ব্বে ফুলিয়া আত্ম-কার্য্যে গরবিণীর ন্যায় যথা তথা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন, ধর্ম্মবলে বলবতী হইয়া অমরনাথের সমক্ষেও উদয় হইতেন, তাহার তেজস্বিনী প্রকৃতি কিছুতেই ভয়ভীতা হইত না। জানিতেন, স্বামী তাহাকে এতদূর বিশ্বাসিনী জানেন, যে সেই স্বামীর ভয় রাখিবার কিছুই নাই। আদরিণী স্পর্দ্ধা করিয়া ভাবিতেন, পুরুষ আবার রমণীর কর্ত্তা কি? রমণীই পুরুষের আজ্ঞাদায়িনী।

লবঙ্গ এই জন্য তেজস্বিনী ছিলেন। তাহার সেই সেই তেজ অন্য কারণেও কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ পতির সোহাগ, ও শাসন-অক্ষমতায় লবঙ্গকে অদমনীয়া করিয়াছিল। তিনি নিজ সোহাগের গৌরবে এবং পতি-সোহাগের গর্ব্বে ফুলিয়া বেড়াইতেন। তিনি

সেই সোহাগে মাতিয়া গৃহ মধ্যে "পুরা একখানি গৃহিণী" হইয়াছিলেন। নবীন বয়সে গৃহিণী হইলে এবং বৃদ্ধ পতির যুবতী সুন্দরী হইলে যেরূপ স্পর্দ্ধা বাড়িয়া থাকে, লবঙ্গের স্পর্দ্ধা সেই রূপই বাড়িয়াছিল। তিনি এই স্পর্দ্ধায় মাতিয়া, সরল মনে যাহা উদয় হইত, তৎক্ষণাৎ বলদর্পিত উক্তিতে লোককে তাহাই প্রয়োগ করিতেন। শাসন কিরূপ,লবঙ্গ তাহা জানিতেন না। শাসন করিবার তাহার কেহই ছিল না ; থাকিলেও লবঙ্গের তেজস্বিনী প্রকৃতিকে শাসন করিতে পারিত কি না সন্দেহ। লবঙ্গ যদি কোন শাসন জানিতেন, তাহা আত্মশাসন, তাহা লবঙ্গের চমৎকার ও অদ্বিতীয় আত্মশাসন। তিনি এই শাসনে প্রকৃতির উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন, অমরনাথের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন, জয়লাভ করিয়া অমরনাথের সমক্ষে অনায়াসে উপস্থিত হইতেন, উপস্থিত হইয়া আর একবার প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দিতেন, তাহার চিরদমিত সোহাগ আর একবার উদ্রিক্ত হইত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ লবঙ্গ যেন আত্মবল পরীক্ষা করিবার জন্যই আবার আত্ম-শাসনের রশ্মি দৃঢ়-সংযত করিয়া লইতেন। তিনি প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া করিতেন। প্রকৃতি যেখানে লবঙ্গের শাসনে না আসিত, সেখানে অবাধে স্বাধীন ভাবে ক্রীড়া করিত ; তাহাতে লবঙ্গের কিছু দমন ছিল না। লবঙ্গ নির্দোষিতায় ও সরলতায় সাহসিনী এবং অদমনীয়া ছিলেন।

অদমনীয়া, কিন্তু অপাপপ্রবণ। তাহার ধর্ম্মবল দেখিয়া পাপ নিকটে আসিতেও শঙ্কিত হয়। একবার চির-অঙ্কিত চোর নামে কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। অমরনাথের চোর-কলঙ্কের অর্থ এই। সে কলঙ্ক লবঙ্গকে সুন্দরবর্ণে স্পষ্টাভিধানে প্রকাশিত করিয়াছে। যে বল লবঙ্গলতার তেজ, স্বাধীনতার দুর্গ, ধর্ম্মের সম্পত্তি, এবং অদমনীয়তার শক্তি, অমরনাথের চোরকলঙ্ক সেই বলের পরিচয়। এ দাগ রিপুর শাসন, যুবাজনের শিক্ষা, পাপের নাম, এবং পাপীর কলঙ্ক। লবঙ্গ এই দাগে শুদ্ধ অমরনাথকে শাসন করেন নাই, সমগ্র পাপ-জগৎকে শাসাইয়া গিয়াছেন।

বিমলা।

বিমলা বঙ্কিমবাবুর আদর্শ-চিত্র। বঙ্কিমবাবু বঙ্গ-কুলবধূকেও যেরূপ স্বাধীনতা ও তেজস্বিতায় ভূষিতা করিতে চাহেন, যেরূপ বুদ্ধিমত্তায় চতুরা করিতে চাহেন, স্বাধীনতার সহিত যেরূপ ধর্ম্মবলে বলবতী করিতে চাহেন, তাহার প্রথম আদর্শ বিমলায় প্রদর্শিত হয়। সে আদর্শের দ্বিতীয় চিত্র মতিবিবি, এবং তৃতীয় ফল লবঙ্গলতা। রাজকুলে ও বয়সে বিমলা, বেশ্যাবৃত্তিতে মতিবিবি, এবং গৃহস্থকুলে ও যৌবনকালে লবঙ্গলতা।

নহিলে সেই তেজ, সেই সাহস, সেই স্বাধীনতা, সেই চতুরতা তিন জনেরই সমান ধর্ম্ম। পতির প্রতি বিমলার স্পর্দ্ধা ও আদর যেমন, লবঙ্গলতারও তেমনি। ধর্ম্মবলে এই দুই জনের কেহই ন্যূন নহেন। মতিবিবি স্পর্দ্ধা করিয়া একদা দিল্লীর সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; আর যদি নবকুমারের অঙ্কস্থানীয় হইতেন, তৎপ্রতি স্পর্দ্ধা ও আদর কিছু ন্যূন হইত না। ইহাদিগের আশা ও অভিলাষ সর্ব্বদা উচ্চদিকেই ধাবিত হইত। হৃদয়ের বল ও দৃঢ়তায় প্রয়োজনকালে তিন জনেই সমতুল্য ছিলেন। আবার তিন জনেরই হৃদয় সমান কামিনীসুলভ তরলতায় তরঙ্গিত হইত।

ভারতে বীরত্বের কাল বহুদিন অস্তগত হইয়াছে। শান্ত, সরলা, মৃদু-প্রকৃতি, ও চিরদুঃখিনী সীতাদেবীর প্রতিমা সেই জন্য বহুকাল ধরিয়া নির্বীর্য্য ভারত কল্পনাকে একাধিকার করিয়াছিল; আজিও অনেক পরিমাণে করিয়া আছে। কেবল ইংরাজী ঔপন্যাসিক-সাহিত্য-পাঠকের মনে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। তাহার কল্পনায় আর এক ধাতুর রমণী-রত্ন উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইতেছে। তিনি মৃদু-প্রকৃতি সতী সাধ্বীর সঙ্গে ক্রমশঃ এই রমণীকুলেরও আদর করিতে শিখিতেছেন। যে স্বাধীনতা ও ধর্ম্মবল, যে বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতা, ইয়োরোপীয় মহিলার সৌন্দর্য্য ও ভূষণ; যে গুণে অলঙ্কৃতা হইয়া ইয়োরোপীয় মহিলাগণ উপন্যাস-ক্ষেত্র সুশোভিত

ও আলোকিত করিয়াছেন; বঙ্গীয় ইংরাজী-সাহিত্য-পাঠক এখন স্ত্রী অঙ্গে সেই সকল গুণের আদর বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি অনেক সময়ে ইংরাজী মহিলার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যান। তাহার স্বাধীন ধর্ম্মবলের সহিত, তেজস্বিতা ও মনের দৃঢ়তার সহিত, বঙ্গমহিলার নিস্তেজ ও মৃদু প্রকৃতির তুলনা করিয়া দেখেন। দেখিয়া তাহার মুখকান্তি বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। তিনি এখন সীতাদেবীর পরিবর্ত্তে দ্রৌপদীকে অধিকতর আদর করিতে চান। সেই আদরে ঔপন্যাসিক-চিত্র কল্পনায় আঁকিতে বসেন। দ্রৌপদীতে রাজকুলাঙ্গনার তেজস্বিতা দেখেন, সীতাদেবীতে ধীরতার সহিত ধর্ম্মবল ও দৃঢ়তা দেখেন, বাঙ্গালিনীতে চতুরতার সহিত নম্রতা ও সহৃদয়তা দেখেন; এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় মহিলাতে স্বাধীনতা সম্ভাবিত দেখেন। পরে এই গুণ-পরম্পরা, কল্পনায় মিলিত করিয়া এক পরমা সুন্দরীর সৃষ্টি করিতে যান। নিজ প্রকৃতির চরিতার্থতা হেতু সেই সুন্দরীকে আমোদিনীও করেন। সেই সুন্দরীর নাম বিমলা। বিমলা আধুনিক ইংরাজী সুশিক্ষিত যুবাজনের কাল্পনিক প্রতিমা। যে চমৎকার কৌশলে বিমলারও সৃষ্টি বঙ্গ উপন্যাসে সম্ভাবিত হইয়াছে, তাহা এই প্রস্তাবের সর্ব্বশেষে প্রদর্শিত হইবে।

যখন বীরধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব ছিল, তখন কুলকামিনীও দ্রৌপদীতে বীরধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। তাহা কালের গুণ, ব্যাসের সৃষ্টি নহে। তখন তেজোবাক্য ও তেজোব্যবহার

ক্ষত্রিয়-কামিনীর সুলভ ধর্ম্ম ছিল। বিমলাও যে কালের কল্পিত কামিনী, সেকালে আর্য্যতেজ সম্যক্ অস্তমিত হয় নাই। বিমলা যে দেশে আশৈশব লালিত পালিত হইয়াছিলেন, মানসিংহের যে তেজস্বী কুলগৌরবে পরিবর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন, তাহাতে বিমলার প্রকৃতি যেরূপ তেজস্বিনী হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছিল। বিমলার তেজ, সাহস ও স্বাধীনতা, মৃদু-প্রকৃতি বাঙ্গালিনীতে দুর্লভ। কিন্তু যে চতুরালি বাঙ্গালিনীর সুলভ ধর্ম্ম, শশিশেখরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিমলায় তাহা সম্ভাবিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু প্রথমে বিমলার কল্পনা এইরূপে বঙ্গপাঠকের মনে সম্ভাবিত করিয়া লইয়াছেন। একবার বিমলা তাহার কল্পনায় সুপরিচিত হইলে, লবঙ্গলতা আর অসম্ভাবিত বোধ হয় নাই। বেশ্যা-বৃত্তি মতিবিবির কথা ধর্ত্তব্য নহে। যে সমস্ত উজ্জ্বলবর্ণের বাহ্যরেখায় বিমলার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা এক্ষণে বোধ হয় সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইল; যে সমস্ত অন্তঃ-সৌন্দর্য্যে সেই চিত্র দ্বিগুণ প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। বিমলার নবীনত্বে আমরা যেমন চমকিত হইয়াছি, তাহার সৌন্দর্য্যে তেমনি চমৎ-কৃত হই।

উপন্যাস-ক্ষেত্রে দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমবাবুর প্রথম উদ্যম। বোধ হয় তজ্জন্যই বঙ্কিমবাবুর ন্যায় বিশুদ্ধ রুচির লেখকও বঙ্গ সাহিত্যের একটি দোষ হইতে সহসা

মুক্ত হইতে পারেন নাই। বিলাসী বাঙ্গালী ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার সৌন্দর্য্যে এত মোহিত, যে একেবারে তাহার সমুদায় ভুলিয়া যাওয়া বড় কঠিন। তাহার হৃদয় মন এই সৌন্দর্য্যে পরিলিপ্ত। সুতরাং ইহার বিমোহন ভাব অজ্ঞাতভাবে তাহার লিখিত চিত্র মধ্যে প্রবেশ করে; প্রবেশ করিয়া সেই চিত্রকে লম্পটের মোহিনী শোভায় ভূষিত করে। বিমলা ইহার দৃষ্টান্ত। বিমলা যখন নিভৃতে কেশ বিন্যাস করিতে বসিয়াছেন, বঙ্কিমবাবু অজ্ঞাতভাবে দ্বারদেশ হইতে উঁকি মারিয়া নিজে বিমলার অর্দ্ধনগ্ন দৈহিক সৌন্দর্য্যে এত বিমোহিত হইয়াছেন, যে সে দৃশ্য পাঠককে না দেখাইয়া থাকিতে পারেন নাই। এ দৃশ্য অতি মোহনীয় ও সুন্দর; কিন্তু এই সুন্দর দৃশ্যে শারীরিক অঙ্গ ভঙ্গি যে রূপে প্রকটিত হয়, তাহা কেবল লম্পটের নিকটেই আদরণীয়। এ চিত্র অতি গ্রাম্য; এবং ভদ্রলোকের কেবল শয়ন-কক্ষে স্থাপনের উপযুক্ত বলিয়াই স্থির হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু এই চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে আঁকিয়াছেন। তিনি ভারতচন্দ্রের ন্যায় বাক্যাড়ম্বর করেন নাই বটে, কিন্তু তুলিকায় যাহা চিত্র করিয়াছেন, মানস-চক্ষে যে ছবি ধরিয়াছেন, তাহা ভারতচন্দ্রের ক্ষমতার অতীত। রূপবর্ণনার ভঙ্গি ও গৌরবে বিমলাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে; বিমলা সেই সজীবতায় পাঠকের মনে উদয় হন। সেই সজীব বিমলার চিত্র বিলাসিনীর রূপমাধুরীতে শোভিত দেখায়।

কিন্তু বঙ্কিমবাবুর নিপুণতা এই যে, তিনি এই দূষিত ভাবে নামিয়াও আশ্চর্য্য কৌশলে অতি পবিত্র ভাবে উঠিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বিমলা-চিত্রের নৈতিক ফল মন্দ দাঁড়ায় নাই! বঙ্কিমবাবু যে বিমলাকে বিলাসিনীর রূপ দিয়াছেন, মদন-রস-লালসাপূর্ণ কটাক্ষ দিয়াছেন, যৌবনের টিপি টিপি হাসি দিয়াছেন, কালজয়ী বক্ষঃ-স্থল দিয়াছেন, স্থূল শরীরের পূর্ণতা ও চম্পকবর্ণের প্রভা দিয়াছেন তাহার বিশেষ কারণ আছে। কামিনীর নিকট তাহার রূপমাধুরী যে কি মহাস্ত্র বিমলা তাহা দেখান। বিমলার কৌশল এই ছিল, বিমলা নিজ রূপ বলে, এবং কটাক্ষ প্রভাবে, যেখানে থাকিতেন, তাহার চারিধারে পাপের মায়াজাল বিস্তার করিতে পারিতেন; বিস্তার করিয়া আপনি বিশুদ্ধ ভাবে অটল থাকিতেন এবং ব্যাধের ন্যায় কার্য্য-সিদ্ধি করিয়া লইতেন। বিমলার রূপ তাহার বুদ্ধিকে সহায়তা করিত, তাহার গুণাবলিকে উজ্জ্বল করিত। বিমলা যে অন্তঃসৌন্দর্য্যে ও গুণরাশিতে ভূষিতা হইয়াছেন, তাহাদিগের অধিকতর উজ্জ্বলতায় তাহার রূপলাবণ্য লুকাইয়া যায়। বিমলা, রূপে যত গৌরবিণী, কার্য্যে, সাহসে, বুদ্ধিমত্তায় এবং পৌরুষে তাহাকে তদপেক্ষা গৌরবিণী ও সজীবতর দেখায়। এমত কি, তাহার গুণগরিমা এত অধিক যে বিমলাকে ভাবিতে গেলে অগ্রে তাহার গুণ-গৌরবই মনে আইসে। বিমলা তেজস্বিনী, চতুরা, সুন্দরী রূপে মনে উদিতা

হয়েন। অগ্রে তাহার গুণ দেখি পরে তাঁহাকে সুন্দরী দেখি। এই চিত্রই প্রকৃত সুন্দরীর চিত্র। কিন্তু এরূপ হইবার একটী কারণ আছে। বিমলার গুণ সকল বিশেষ প্রকার। এদেশীয় কামিনীর অঙ্গে এরূপ অসামান্য গুণাবলির সমাবেশ হওয়াতে তাহা সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। নহিলে, বিমলা যদি সামান্যা মৃদু-প্রকৃতি কামিনীর গুণরাশিতে ভূষিতা হইতেন, তাহা হইলে তাহার বিমোহন রূপের চিত্র ঢাকিয়া পড়িত কি না সন্দেহ। চিত্র আঁকিবার কৌশল এই।

বিমলা তিলোত্তমাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। অনেক কারণে তিলোত্তমা তাহার বিশেষ স্নেহভাগিনী হইয়াছিলেন। বিমলার নিরপত্যতা তিলোত্তমাকে কন্যা-স্থানীয় করিয়াছিল, তিলোত্তমার বয়স্ ও মৃদু প্রকৃতি তাহাকে সখীত্ব দিয়াছিল, এবং তাহার জন্ম ও অবস্থায় বিমলা তাহার প্রতি বিশেষ অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। বিমলা তাহাকে একদা কন্যাভাবে স্নেহ করিতেন, সখীভাবে ভালবাসিতেন এবং নিজের ন্যায় সমদুঃখিনী বলিয়া তাহার প্রতি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিশেষরূপে অনুরাগিণী ছিলেন। তিলোত্তমার বয়স্ ও যৌবনবৃদ্ধি, বিমলা দেখিয়া চঞ্চল হইতেন। ভাবিতেন, তিলোত্তমার বিবাহ কিরূপে হয়? কিন্তু বিমলার অভিলাষ উচ্চদিকেই ধাবিত হইত। উপযুক্ত পাত্র না পাইলে তাহার প্রিয়-সখী তিলোত্তমাকে তিনি কাহাকেও দিতে পারিবেন না।

এমত সময় একদা জগৎসিংহের সহিত দেব-মন্দিরে তাহাদিগের সাক্ষাৎ ঘটিল। তিলোত্তমার যৌবন ও রূপ প্রভাবে জগৎসিংহের চিত্ত-চাঞ্চল্য বিমলা দেখিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, তিলোত্তমার অপাঙ্গে কটাক্ষ লুকাইতেছিল। বিমলা চাহিবামাত্র তিলোত্তমার নয়ন-পল্লব উপর্য্যুপরি দুইবার পতিত হইল; তিনি অঞ্চলে বদনদেশ ঝাঁপিয়া দিলেন। তিলোত্তমার এই ভাব দেখিয়া বিমলা অধর-প্রান্তে মৃদু হাসিলেন এবং কহিলেন, কি লো, শিব সাক্ষাৎ স্বয়ম্বরা হবি নাকি? জগৎসিংহের পরিচয় পাইয়া বিমলার মন স্মৃতির কত রমণীয় ভাবে বিচলিত হইয়া উঠিল। জগৎসিংহকে একদা কতক আপনার আপনার জ্ঞান হইতে লাগিল। ভাবিলেন, এইরূপ পাত্রই তিলোত্তমার উপযুক্ত। জগৎসিংহ যদি তিলোত্তমার স্বামী হন, তদপেক্ষা আর কিছুই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু এপথে যে কণ্টক তাহাও তিনি ভাবিলেন। তথাপি এ বাঞ্ছনীয় সুখের আশা তিনি একেবারেও পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। মানসিংহের গৃহে তাহার পূর্ব্ব সৌভাগ্য একবার মনে উদয় হইল। সেইরূপ সৌভাগ্যশালিনী হইতে আর একবার আশা হইল। এই সমস্ত ভাবে বিচলিত হইয়া বিমলা জগৎসিংহকে সেই দেবমন্দিরে দেখা সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। তিলোত্তমার সহিত তাহার বিবাহ সংঘটনে তিনি ব্রতী হইলেন। আমরা বিমলাকে যখন এই প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নবতী

দেখি, তখন বিমলা আমাদিগের নিকট কেমন মধুর বোধ হয়েন। একাকিনী রজনীযোগে যখন তিনি শৈলেশ্বর সাক্ষাতে গমন করিতেছেন, তখন তিনি ঠিক প্রেমদূতীর প্রতিকৃতি রূপে আমাদিগের নিকট প্রতীত হয়েন। তাহার অগ্রে অগ্রে সাহস ও আনন্দকে আমরা কল্পনায় দেখিতে পাই। তৎপূর্ব্বে আশা, অভিলাষ, ও প্রিয়সখীর হিতকামনা পশ্চাৎগামী দেখি, এবং ইহাদিগের পূর্ব্বে বিমলা দিগ্‌গজের সহিত রঙ্গরস করিতে করিতে অগ্রসারিণী হইতেছেন। এ সময়ে বিমলা এত মোহিতা, যে তিনি একবারও মনে ভাবেন নাই, যে জগৎসিংহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ না হইবারও সম্ভাবনা আছে। বিমলা যেমন এই সময়ে মোহিত হইয়াছিলেন, আমরাও তাহাকে দেখিয়া তদ্রূপ মোহিত হইয়াছি। ভাবিয়াছি, এইখানেই বিমলা। বিমলা নির্ভীক মনে, উচ্চ অভিলাষে উৎফুল্লা হইয়া, হিত কামনায় উদ্যোগিনী হইয়া, আনন্দে গীত গাইতে গাইতে একাকিনী রজনীযোগে প্রান্তর দিয়া গমন করিতেছেন,—আর দিগ্‌গজকে ভয় দেখাইয়া আপনি তামাসা দেখিতেছেন। যদি বিমলাকে কেহ দেখিতে চাও, এইখানে বিমলাকে দেখ। দেখিয়া বল দেখি, বিমলার প্রকৃতি কেমন মধুর, কেমন স্বাধীন, কেমন নির্ভীক ও সাহসী, কেমন হিতচিকীর্ষু, কেমন উচ্চাভিলাষী, কেমন প্রেমব্রতী, কেমন প্রফুল্ল ও রঙ্গরস-প্রিয়। তুমি কি এরূপ রমণী সচরাচর দেখিয়াছ? যদি

না দেখিয়া থাক, স্বীকার কর, বিমলা তোমার মনো-মোহিনী বটে।

বিমলার এই স্বাভাবিক ভাব,—এই নিশ্চিন্ত, স্বাধীন, উল্লাসিনী বিমলা। কিন্তু বিমলার আর এক ভাব আছে। বিমলা সে ভাবে গায়িকা, রঙ্গরস-প্রিয়া প্রেমদূতী হইতে বিভিন্ন। তিনিও সেই স্বাধীন, নির্ভীক, ও সাহসিনী বিমলা বটে, কিন্তু তাহার শরীরে উচ্চতর গুণ এরূপ বিকসিত হইয়াছে যাহাতে তাহাকে যেন আর একটী স্বতন্ত্র বিমলা করিয়াছে। বাস্তবিক দুর্গেশ-নন্দিনীতে আমরা বিমলাকে তিন ভাবে দেখিতে পাই। বিমলা ক্রীড়া-কৌতুকিনী, বিমলা নিজ-প্রবৃত্তি-পরায়ণা, বিমলা নিপীড়িতা তেজস্বিনী রমণী-রত্ন। প্রবৃত্তি-পরায়ণা বিমলা অতি মধুরা, ক্রীড়াকৌতুকিনী বিমলা অতি রসিকা, এবং নিপীড়িতা বিমলা রমণীদুর্লভ সাহসিনী, বুদ্ধিমতী, এবং পুরুষার্থে পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিমলার হৃদয় কেমন মধুর জানিতে হইলে, দেখ বিমলা তিলো-ত্তমার জন্য কেমন স্নেহপূর্ণ হইয়া তাহার দৌত্য-কার্য্যে একাকিনী তমিস্রা রজনীতে অগ্রসারিণী হইতেছেন। ইহা তাহার হৃদয়ের কার্য্য—ইহা বিমলার আমোদ ও সুখ। আর যদি তুমি বিমলার ক্রীড়া-কৌতুকিনী লঘু প্রকৃতির আধ আধ নৃত্য দেখিতে চাও, বিমলা কেমন সামান্য সামান্য মধুর গুণে ভূষিতা, তাহা যদি দেখিতে চাও; যে মলয় দেশ হইতে প্রভঞ্জনের বলবীর্য্য ভীষণ

বেগে বিনির্গত হয়, সেই মলয় দেশ সময়ে সময়ে কেমন ফুর ফুর করিয়া সন্ধ্যার সমীরণও মৃদুতরঙ্গে একে একে ছাড়িতে থাকে, ছাড়িয়া চন্দ্রভাসিত যমুনা-লহরীর সহিত কৌতুক করিতে থাকে, প্রাসাদোপরি কুলকামিনীর অলকান্ত উড়াইয়া এবং বৃক্ষশিরে নব কিসলয়কে নাচাইয়া নাচাইয়া আনন্দে বহিয়া যায়, ইহা যদি তুমি দেখিতে চাও,—তবে যাও, যেখানে বিমলা কেশবিন্যাস করিয়া বীরেন্দ্রসিংহের নিকট রূপ দেখাইতে গেলেন, যেখানে বিমলা আশমানির সঙ্গে গজপতির সহিত রঙ্গরস করিতেছেন, এবং যখন বিমলা দিগ্‌গজের সঙ্গে শৈলেশ্বরাভিমুখে মন্দ সমীরণের মত বহিয়া যাইতেছেন; সেই স্থানে এবং সেই সময়ে বিমলাকে দেখিয়া বল দেখি বিমলা কি শুদ্ধ রমণীয়তায় ভূষিতা নহে? কিন্তু যদি তুমি দেখিতে চাও সেই সান্ধ্য সমীরণ আবার কেমন প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিতে পারে; সেই চন্দ্রভাসিত, লহরী-নর্ত্তিত, যমুনার জলে কত বল ও বেগ ধারণ করে; কালিন্দী আবার কেমন বিভীষণ রূপে মূর্ত্তিমতী হইতে পারেন, যদি বিমলার উচ্চ গুণ সকল তুমি দেখিতে চাও, তাহার সারবত্তা ও পুরুষকার দেখিতে চাও, তাহার বুদ্ধিবল ও চাতুরী দেখিতে চাও, তাহার দৃঢ়তা ও প্রতিহিংসা দেখিতে চাও, তাহার দুর্দমনীয়তা ও সাহস দেখিতে চাও, তাহার রমণীদুর্লভ হৃদয়বল দেখিতে চাও,—তবে যাও, যেখানে চতুরে চতুরে সাক্ষাৎ হইতেছে,

সেইখানে বিমলা ওসমানের সহিত তেজস্বিনীর বলদর্পিত বাক্যে কেমন কথাবার্ত্তা কহিতেছেন তাহা দেখ, যেখানে বিমলা প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মানা হইয়া স্বচক্ষে ও স্থির-চিত্তে বীরেন্দ্রসিংহের শিরশ্ছেদ দেখিতেছেন তাহা দেখ, যখন বিমলা স্বামীহন্তার কঠোর বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া আসিতেছেন তাহা দেখ, এবং এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বল দেখি একি সেই ক্রীড়া-কৌতুকিনী বিমলা? এ বিমলার শত্রু হইতে তোমার ভয় হয় কি না? এ বিমলাকে মিত্ররূপে লাভ করিতে তোমার বাসনা হয় কি না? ইহাতে প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধিপ্রদ কার্য্যকৌশল আছে কি না? যদি থাকে তবে বল বিমলা সামান্যা রমণী-রত্ন নহেন।

কুসুমে যে সুরভি আছে, তাহা সমীরণের আঘাত প্রাপ্ত না হইলে স্ফূর্ত্তি পাইয়া চারিদিকে বিস্তারিত হয় না। বিমলার হৃদয়ে যে বল, যে দৃঢ়তা, যে ধৈর্য্য, যে সাহস ছিল, বিমলা নিপীড়িতা না হইলে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। নিগ্রহ ও নির্যাতনে যে হৃদয় দমিয়া যায়, সে হৃদয় নিতান্ত দুর্ব্বল ও অপৌরুষেয়; কিন্তু যে হৃদয় বিপত্তিতে আরও স্ফূর্ত্তি পাইয়া উঠে, যেন তখনই তাহার বল দেখাইবার সময়, সেই হৃদয় যথার্থ তেজস্বী বলিতে হইবে, এবং সেই হৃদয় বিমলার ছিল। বিমলা সেই হৃদয়ে বীরপঞ্চমীর ব্রতে ব্রতী হয়েন এবং চতুরে চতুরে ঘিহৃষা সাক্ষাৎ হওয়াতে ওসমানকে বলদর্পিত বাক্যে

তেজস্বিতা দেখান। বিমলা ঘোর বিপত্তিতে পড়িয়া বরাবর অতি স্থৈর্য্যের সহিত, দৃঢ়তার সহিত, এবং সাহস ও তেজস্বিতার সহিত সকল বিপত্তির উপর জয়ী হইয়া উঠিয়াছেন। বিমলার শরীরে যে রমণীদুর্ল্লভ অসামান্য গুণগ্রাম ছিল, তাহা দেখাইবার জন্যই কবি তাহাকে যথোপযোগী বিপদের মধ্যে ফেলিয়াছেন। ফেলিয়া দেখাইলেন, তৎপূর্ব্বে বিমলা যে সমস্ত গুণে পাঠকের হৃদয় হরণ করিয়াছেন, তাহা বিমলার অতি সামান্য গুণ, তদপেক্ষা উচ্চতর গুণে বিমলার রূপ উজ্জ্বলিত হইয়াছে, এবং তাহাকে বীরেন্দ্রসিংহের উপযোগিনী রাজমহিষী করিয়াছে। তিনি তোমার আমার গৃহে শোভা পান না। তাহার যে স্থান উপযুক্ত, বঙ্কিমবাবু তাহাকে সেই স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। তাহার মত রমণীমণি রাজকুলেই শোভা পায়। তিনি রাজমহিষী হইবারই উপযোগিনী। রাজমহিষীর যেরূপ বীরধর্ম্মিণীর তেজস্বিতা ও হৃদয়বল থাকা আবশ্যক, বিমলার তাহা ছিল। বিমলার চিত্রে বঙ্কিমবাবু রাজকুলোচিত বীরাঙ্গনার উচ্চ গুণ সকল স্পষ্টাভিধানে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিমলার আদর আমরা জানি না। বিমলার আদর বীরধর্ম্মী নরপতির কাছে। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস উচ্চবংশীয়ের নিকট যত আদরণীয়, সামান্য জনগণের নিকট তত আদরণীয় নহে। ইহার প্রধান [illegible] বিমলা।

সমাপ্ত।